দেব সাহিত্য কুটীর

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর প্রাইভেট লিঃ
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

রাস পূর্ণিমা—
১৩৭১

ছেপেছেন—
এস. সি. মজুমদার
দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

পূর্ব্বাভাষ

বাঙলা ১৩০০ সাল-এর কিছু আগেকার কথা। ইংলণ্ডের রাজ-সিংহাসনে তখন মহারাণী ভিক্টোরিয়া; ব্রিটিশ-ভারতেরও তিনি তখন অধীশ্বরী। এদেশের মেয়েদের তখন ইংরেজীতে উচ্চ-শিক্ষা-লাভ প্রায় অজ্ঞাত ছিল। মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে এদেশের মেয়েরা বলিত, রাণী-মা। মেয়েদের মুখে তখন এমন কথাও শুনা যাইত—মেয়ে বলে অত হেনস্থা করো না, জানো, কার রাজ্যে বাস করছো?

যন্ত্র-সভ্যতার শুভাশুভ ফল তখন এতখানি প্রত্যক্ষ না থাকায় মানুষ যেন একটু স্বস্তিতে থাকিত; বিশেষ ভারতবর্ষের মত অভাবগ্রস্ত দেশে। ফ্যান্, লাইট্, মোটর-কার, ইলেকট্রিক ট্রাম, বাস এবং এরোপ্লেন ইত্যাদি সেদিন ছিল কল্পনার অগোচর। তার জন্য অভাব-বোধও ছিল না।

আমরা যে-দিনের কথা বলিতে বসিয়াছি, তখন ভাব-প্রবণ বাঙালীর চিত্তে সামাজিক ও সাংসারিক পরিবেশে ভাবের বন্যা বহিত। কত ছোট-খাটো দুঃখ-সুখের তরঙ্গের মুখে বাঙলার কাব্য-সাহিত্য রূপায়িত হইয়া উঠিত। রাম-সীতা না থাকিলে যেমন রামায়ণের সৃষ্টি সম্ভব ছিল না, তেমনই সে-দিনের সে সমাজ বাঙালীকে গর্ব্ব করিবার মত, সযত্নে রক্ষা করিবার মত, দশের মধ্যে বিতরণ করিবার মত অনেক কিছুই দিয়াছিল। তার দেওয়া তখনো বন্ধ হয় নাই।

বঙ্কিমের উদাত্ত কণ্ঠে তখন সপ্তকোটী কণ্ঠে কলকল 'করাল' নিনাদ ধ্বনিয়া উঠিবার উপক্রম করিয়াছে।

"কতকাল পরে বল ভারত রে,
দুখ-সাগর সাঁতারি পার হবে ?"

এই সকরুণ সঙ্গীতে ভারতের অবলুপ্তপ্রায় চেতনার মৃদু-সঞ্চার আরম্ভ হইয়াছে। স্বদেশী-মেলায়, স্বদেশী গানে, স্বদেশী ভাবে তখন বাঙলার তরুণ রবি প্রাচ্যের ললাটে ভাস্বর জ্যোতি বিকিরণ আরম্ভ করিয়াছেন। রবির কিরণে সুর উঠিয়াছে—

"একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্, জগতজনের শ্রবণ জুড়াক্ !
হিমাদ্রি-পাষাণ কেঁদে গ'লে যাক্, মুখ তুলে আজি চাহ রে।"

সে-দিন ছিল আজিকার দিনের পূর্ব্বাভাষ। উষা না আসিলে দিবসের উদয় হয় না। সেই উষায় এ-বাঙলার যতখানি চোখে পড়িয়াছিল, তাহারি একটু পরিচয় এ-কাহিনীতে সত্য-বর্ণে দিবার চেষ্টা করিয়াছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিন্ধ্যগিরির একাংশে বিরাট শৈলশ্রেণী। দেখিলে মনে হয়, যেন একরাশ ঘন মেঘ জমিয়া আছে। এই পর্ব্বতমালার বুকে সুন্দর সহর। সহরের বুকে সাব-ডিভিশনাল অফিসারের সুন্দর-সজ্জিত বাংলো—নিপুণ চিত্রকরের হাতে আঁকা ছবির মত দেখায়!

ছোট সহর। লোকের বসতি বেশী নয়। লোকজনের অভাব-অভিযোগও অল্প। রেলোয়ে-লাইন হইতে বহুদূরে অবস্থিত বলিয়া বাহিরের সভ্যতার নব-নব তরঙ্গ সহরকে স্পর্শ করিতে পারে না। সহরের লোকজন তাহাদের অল্প লইয়াই সন্তুষ্ট আছে; না-পাওয়া কোন-কিছুর জন্য তাহাদের মন অধীর হয় না।

ষ্টেশন হইতে সহরে আসিতে ঘোড়ার গাড়ীর ডাক বসাইতে হয়। সে ডাক বসাইয়া সহরে আসিতে তিন দিন সময় লাগে। ঘোড়ার গাড়ীতে আসিতে খরচ পড়ে বেশী; সাধারণ লোকে তাই উটের গাড়ীতে যাওয়া-আসা করে। উটের গাড়ীতে পাঁচ দিনের কমে আসা যায় না।

ষ্টেশন হইতে সহরে আসিতে পথে তিনখানি ডাক-বাংলো আর ক'টা চটি আছে। সেখানে চাল ডাল নুন তেল শাক-সব্জী

এবং গুড় পাওয়া যায় ; ইহার অতিরিক্ত কিছু প্রয়োজন থাকিলে তাহা সঙ্গে আনিতে হয়।

এ-অঞ্চলে হিংস্র জন্তুর উপদ্রব কিছু কম। নিবিড় জঙ্গলময় প্রদেশ। শালের ঘন বন। হরিণের দল নির্ভয়ে এখানে-সেখানে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে। গাছে-গাছে পাখীর কলকূজন। ময়ূরের কেকা। পুচ্ছ তুলিয়া ময়ূরের দল দাঁড়াইয়া আছে। পুচ্ছে রামধনুর সাতটা বর্ণ ঝকমক করিতেছে। বন-ফুলের বিচিত্র সজ্জা। এই বনের পথ ধরিয়াই সহরে যাতায়াত করিতে হয়। দিগন্ত-ব্যাপী এ-বন যেন প্রাচীর তুলিয়া সভ্য-সমাজ আর এই সহরের মাঝখানে ব্যবধান রচিয়া রাখিয়াছে।

সাব-ডিভিশনাল অফিসার বাঙালী। তিনি ছাড়া আর একজন বাঙালী আছেন—ডাক্তার। কিন্তু নামেই ডাক্তার, আসলে ক্যাম্পবেল স্কুলের পাশ-করা কমপাউণ্ডার।

বাংলোখানি বড় নয়, কিন্তু চমৎকার! পাশাপাশি বড়-বড় চারখানি ঘর। দু'পাশে টানা বারান্দা। এ-ছাড়া আশেপাশে ছোট-খাটো দু-একটা ঘরও আছে। রান্না-বাড়ী বাংলো-বাড়ী হইতে খুব দূরে নয়। বাংলোর একদিকে বড়-বড় গাছের ছায়ায় ঘেরা রাজপথ, দু'-দিকে খোলা মাঠ—যতদূর দৃষ্টি চলে সবুজ-রঙের রাজ্য—বাধা-বিচ্ছেদবিহীন। বাংলোর সামনের দিকে কাঁকর-ফেলা পথ। পথের পাশে ভেরেণ্ডার বেড়া-ঘেরা একখানি বাগান। বাগানে নানা জাতের গোলাপের সংখ্যাই বেশী। বাংলোয় যিনি থাকেন, তিনিই সখ করিয়া গোলাপের বাগান করিয়াছেন। বাড়ীতে নিজের হাতের তৈরী বাগান ফেলিয়া আসিয়াছেন, এখানে বাগানের সে-সখ মিটাইতে এতটুকু শৈথিল্য নাই। এছাড়া এদিকে-ওদিকে

বাঁধানো বড় কূয়া এবং কূয়ার পরেই কাছারি, আর ট্রেজারী ; পিছন-দিকে জেলখানা। সহর এ-মহল্লা হইতে অনেকখানি দূরে।

গয়া হইতে বদলি হইয়া আনন্দবাবু প্রথমে একা এখানে আসেন—সম্প্রতি স্ত্রী-পুত্র-পরিবার আনিয়াছেন। একটি শিশু-পুত্র, দুটি কন্যা এবং আনন্দবাবুর পুত্রবৎসল পিতাও আসিয়াছেন।

নির্জ্জন গৃহ এখন আনন্দ কলরবে পূর্ণ।

আনন্দবাবু ভোরে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সারিয়া গায়ত্রী জপ করেন, তারপর জলযোগান্তে ঘোড়ায় চড়িয়া বাহির হন। ঘর-দ্বার হাল ফ্যাশনে সজ্জিত। চাকরির খাতিরে পোষাকও আধুনিক। স্ত্রী এবং মেয়েদের একালের মত শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে। তবে সন্ধ্যা-আহ্নিক ত্যাগ, পৈতা ফেলা বা নিষিদ্ধ খাদ্য-ভোজনে কাহারও স্পৃহা নাই। বাড়ীতে বামুন আছে—রান্না করে। আয়া বাবুর্চি বা চায়ের পাঠ নাই। নিজস্ব এক ভৃত্য আছে ; আর আছে সরকারী দুজন চাপরাশি।

আনন্দবাবুর পিতার গোঁড়ামি নাই। তাহা না থাকিলেও তিনি সনাতন আচার-নিষ্ঠা মানিয়া চলেন। পুত্র আনন্দবাবু পিতার কাছে এই শিক্ষা পাইয়াছেন ; তিনিও আচার-নিষ্ঠা ত্যাগ করেন নাই। ইংরাজী-শিক্ষার ক্ষীরটুকু গ্রহণ করিয়াছেন, সে-শিক্ষার নীর—অর্থাৎ বাহ্যিক ফ্যাশন বা আড়ম্বর গ্রহণ করেন নাই। অনেক বিষয়ে পিতা এবং পুত্র উদার-পন্থী—তবু আচার-নিষ্ঠার দিক দিয়া দুজনেই সনাতনী রহিয়া গিয়াছেন।

আনন্দবাবুর পিতা পণ্ডিত মানুষ। সরকারী চাকরি করিতেন ; এখন পেনশন লইয়াছেন। তাঁহার দুই পুত্র। পেনশন লইয়া অবধি তিনি দুই পুত্রের কাছে ভাগাভাগি ভাবে বাস করেন। পুত্র-পৌত্রাদির উপর অগাধ স্নেহ বলিয়া বানপ্রস্থ লইয়া কাশীবাস করার সঙ্কল্প

তাঁহার মনে স্থান পায় নাই। পুস্তক পাঠ ও গ্রন্থ রচনা করিয়া সময় কাটান। তাছাড়া চিকিৎসায় জ্ঞান আছে। যেখানে যান, রোগী দেখেন, দেখিয়া তাদের ঔষধ-পথের ব্যবস্থা করেন। এখানে আসিয়াও এ-নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। প্রত্যহ সুর্য্যোদয় হইতে বেলা দশটা পর্য্যন্ত বাড়ীর পিছনে যে মাঠ, সে-মাঠ রোগী আর ভিখারীতে ভরিয়া যায়। তিনি দেখিয়া ঔষধ-পথ্য দেন। ভিখারীদের কাহাকেও বস্ত্র, কম্বল বা ভোজনপাত্রও জোগাইতে হয়। সাধ্য থাকিলে প্রার্থীকে বিমুখ করেন না। চিকিৎসায় তাঁহার খ্যাতি আছে—তাঁহাকে কঠিন দুরারোগ্য ব্যাধি সারাইতে দেখিয়া অনেক ডাক্তার-বৈদ্যও বিস্ময়-শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন।

এমনি করিয়া সমাজ-বান্ধব-বিহীন অরণ্যপ্রদেশে আত্মীয়-বন্ধুর সৃষ্টি করিয়া তনি পরমানন্দে আছেন। পরের উপকার করিতে পিতা-পুত্রকে কখনও উদাসীন দেখা যায় না। শিক্ষিত বয়স্ক পুত্র—বড় চাকরি করেন—তবু পিতাকে এখনও মানিয়া চলেন—পিতা যেন দেবতা! আনন্দবাবু যেন পিতার ছায়া!

আনন্দনাথের স্ত্রী করুণাময়ী সত্যই করুণাময়ী! রূপে গুণে তাঁহার যেন তুলনা নাই! আনন্দনাথের পিতা তাঁহাকে দেখিয়া যাচিয়া বধূ করিয়া ঘরে আনিয়াছেন। বালিকা বধূ শ্বশুরের স্নেহে তাঁর মেয়ের মতই সুখে আছেন। এমন শান্ত মিষ্ট স্বভাবের মেয়ে বড় দেখা যায় না! মুখে কথা নাই—কি করিয়া সকলের মন বুঝিয়া চলেন, সকলে দেখিয়া আশ্চর্য্য হন। শ্বশুর বলেন, "ও নিজের কথা বলতে জানে না। ওকে বুঝে কে ওর যত্ন করবে!" শাশুড়ী বহুপূর্ব্বে মারা গিয়াছেন; তিনি একাই শ্বশুর আর শাশুড়ী দু'জনের কর্ত্তব্য করিতেছেন।

আনন্দনাথের মেয়ে দুটি মা-বাপের চেয়ে ঠাকুরদাদারই বেশী অনুগত।

স্ত্রী

বড় মেয়ে সুলতার বয়স আট বছর; ছোট অনিন্দিতার বয়স পাঁচ কিংবা ছয়।

বোন দুটিতে খুব ভালোবাসা। তিন বছরের বড় সুলতা ছোট বোনকে সব সময়ে আগলাইয়া রাখে। সুলতার যেমন বুদ্ধি, তেমনি সে শান্ত। ছোট অনিন্দিতা একটু চঞ্চল এবং সে অত্যন্ত অভিমানী। দিদির আদরেই এমন অভিমানী হইয়াছে। দিদি তার আদর্শ। দিদি যাহা বলিবে, দিদি যাহা করিবে, সে জানে, তাহাই সব। দিদির মত আর কেহ কিছু বলিতে পারে না— করিতে পারে না। সব বিষয়ে দিদিকে দেখিয়া দিদির মত সে হইতে চায়। দিদির বিচ্ছেদ সে একদণ্ড সহিতে পারে না। সে চায় দিদি শুধু তাহারই থাকিবে, দিদির ওপর আর কাহারও কোন দাবী থাকিবে না। বাবা-মার ভাগ সে সহজে দিতে পারে, কিন্তু দিদির ভাগ কাহাকেও দিতে পারে না। দিদি পুরাপুরি তাহারই!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বর্ষার মেঘ-বৃষ্টি প্রায় কাটিয়া আসিয়াছে। রৌদ্রে যেন অগ্নির দাহ! আনন্দনাথের বাংলো-বাড়ীর চারিদিকে মাঠগুলি শ্যামল শ্রীতে ভরিয়া উঠিয়াছে। দেখিলে মনে হয়, কে যেন প্রান্তর জুড়িয়া ঘন পুরু পার্শিয়ান কার্পেট পাতিয়া রাখিয়াছে। সামনের বাগানে গোলাপ-গাছের পাশে-পাশে রজনীগন্ধার ঝাড়—ফুলে-ফুলে ফুলময়। মনে হয়, সাদা বাতির ঝাড় দুলিতেছে যেন!

বৈকালে সাজসজ্জা করিয়া সুলতা আর অনিন্দিতা বেড়াইতে বাহির হইবে, রজনীগন্ধার ঝাড়ের দিকে দৃষ্টি পড়িল। বাতাসে ঝাড় দুলিতেছে, থোলো-থোলো রজনীগন্ধা দুলিতেছে। মনে হইল, ফুলগুলা যেন হাতছানি দিয়া তাহাদের ডাকিতেছে! ফুলের ডাক সকলে শুনিতে পায় না; সুলতা পায়। সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া জানালার ধারে দাঁড়াইলে সুলতার মনে হয়, সকালের সোনালী রৌদ্র যেন তাহাকে ডাকিতেছে! বৈকালে বাগানের চাতালে বসিয়া ফুটন্ত ফুলগুলির দিকে চাহিলে মনে হয়, তাহারা যেন মাথা দুলাইয়া সুলতাকে ডাকিতেছে! ঝির-ঝির করিয়া বাতাস বহিতে থাকে, সুলতার মনে হয়, বাতাস যেন তার গায়ে-মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছে—তাহাকে যেন কত কি বলিবে! আকাশে সাদা-সাদা মেঘ চলে, কাহারও মাথা হাতীর মত, পা ঘোড়ার মত, কোনটা পাহাড়ের মত, কোনটা সিপাহীর মত বন্দুক-ঘাড়ে, এদের মধ্যেও যেন কত ভাষা জমিয়া আছে—একটু কান পাতিলেই যেন শুনা যাইবে! কিন্তু তেমন করিয়া কান পাতা সুলতার পক্ষে অসম্ভব! তার বোনের কণ্ঠে মা-সরস্বতী অহর্নিশি বসিয়া আছেন! যত তার

কৌতূহল, তত তার প্রশ্ন। একটা কথার উত্তর শেষ হইতে না হইতেই হাজারটা প্রশ্ন আসিয়া পড়ে!

উত্তর না দিলে নিস্তার নাই! জানি না বলিলেও রক্ষা নাই!… "হ্যাঁ তুমি জানো, নিশ্চয় তুমি জানো, আমায় বলচো না! বলো, বলো, শীগগির বলো।"

অগত্যা সুলতাকে সাম্‌লাইতে হয়। চারিদিকের অশ্রুত কাহিনী, চির-অশ্রুত থাকিয়া যায়। এম্‌নি করিয়া কত সময় কত অচেনা পাখীর না-শোনা গান তাহার শোনা হয় না! পাশে বসিয়া অনিন্দিতা অনবরত বলিতে থাকে, "দিদি, ওটা কি পাখী? ডানায় লাল রং, নীল রং, আর ওই—ওই যে আর-একটা রং, ওটাকে কি রং বলে?"

আজ রজনীগন্ধার ডাকে সে বাগানের জাফ্‌রীর বেড়া ঠেলিয়া বাগানে গিয়া ঢুকিল। বড় লম্বা ঝাড়, আগাগোড়া ফোটা-ফুলে ভরা, মাথার কাছে শুধু গোটাকতক কুঁড়ি। মৃদু বাতাসে নাচিয়া যেন বলিতেছে, 'তুমি যে দুটি বেলা আমায় দেখতে আসতে, নিজের হাতে গাছে কত জল দেছ—এসো, দেখ, আমি কি-রকম হলুম!'

বাঃ! কি চমৎকার গন্ধ! "অনি! অনি! দেখে যা আমার পোঁতা রজনীগন্ধার ঝাড়ে সব ফুল প্রায় ফুটে উঠেছে।"

দিদির ছায়ার মত অনিন্দিতা পিছনে থাকে। আজও ছিল, সে বলিল, "আর আমার গাছটা মরে গেল, তুমি বাঁচাতে পারলে না তো!"

সুলতা হাসিয়া উঠিল, "তুমি রোজ একবার ক'রে গাছটা তুলে-তুলে শেকড় বাড়ছে কিনা দেখতে লাগলে, তাতে গাছ মরবে না?"

ঠোঁট ফুলাইয়া অনিন্দিতা বলিল, "বারে, শেকড় তো গেঁড়ো! তুমি বল্‌ছো শেকড়!"

সুলতা আরও জোরে হাসিল—হাসিতে-হাসিতে বলিল, "আচ্ছা বেশ, গোঁড়োই হলো। তুমি রোজ তুলে-তুলে দেখতে কেন? বারণ করিনি? তুমি সে-বারণ শুনেছিলে?"

গম্ভীর-কণ্ঠে অনিন্দিতা জবাব দিল, "তা নাহয় শুনিনি। তবু ইচ্ছে করলে তুমি আমার গাছটাকে বাঁচিয়ে দিতে পারতে।"

সস্নেহে বোনের গাল টিপিয়া দিয়া দিদি কহিল, "দিদি তোর ভগবান, না রে? ইচ্ছে করলেই যাকে হোক্ বাঁচিয়ে দিতে পারে।"

অনিন্দিতা চটিল, দিদির মুখে তীব্র দৃষ্টি হানিয়া বলিল, "পারে না তো কি? লক্ষ্মণকে যখন রাবণ শক্তিশেলে মেরে ফেললে, বিশল্যকরণী নিয়ে এসে তাঁকে বাঁচালো না? আমি তোমায় কতবার বলেছিলুম, তুমি বিশল্যকরণী নিয়ে এসো, এনে আমার গাছকে বাঁচাও। আর সেই মরা প্রজাপতিটার বেলাতেও বলেছি, তুমি শুনেছিলে? তার বেলায় আর দোষ হয় না—না:"

সুলতা বলিল, "হয় না-ই তো। কি করে হবে, বল্? আমি যখন বললুম, বিশল্যকরণী আনবার জন্য বীর হনুমান চাই, আমার তো হনুমান নেই, শুধু একটি অনুমণি আছে। বললুম, তুই গন্ধমাদনে যা, গিয়ে বিশল্যকরণী নিয়ে আয়, তবে তো বাঁচাবো! তুই গিয়েছিলি?"

অনিন্দিতা কাঁদো-কাঁদো হইয়া উত্তর দিল, "বা রে, সব ভুলে যান্। আমি বুঝি যেতে চাইনি? মা-ই তো যেতে দিলেন না।"

বোনটির গায়ে হাত বুলাইয়া সুলতা বলিল, "ঠিক, ঠিক, আমি ভুলে গিয়েছিলুম! আচ্ছা, এক কাজ কর্, এই গাছটা তোর হোক্! কেমন?"

—"বা রে, তাহলে তোমার গাছ?"

—"আমার গাছ নাই বা থাকলো।"

—"না, তা কখনো হয়? আমি আস্‌ছে-বছর আবার গাছ পুঁতবো, সেবার আর একদিনও শেকড় তুলে দেখবো না।"

—"সেই ভালো, চল্, মা'র জন্যে একটা সাদা গোলাপ তুলে নিয়ে যাই, মা'র খোঁপা বাঁধা হলে পরিয়ে দেবো।"

—"আমি দেবো।"

—"তাই দিস্।"

পাতাশুদ্ধ একটি সাদা গোলাপ তুলিয়া সুলতা অনিন্দিতার হাতে দিল। ফুলটি লইয়া অনিন্দিতা বাড়ীমুখো হইয়া কি ভাবিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "ফুল তুমি পরিয়ে দেবে চলো, আমি পরাতে গিয়ে যদি ছিঁড়ে ফেলি?"

ফুল না লইয়া সুলতা বোনটির হাত ধরিল, "তুই নিয়ে চ, আমি পরিয়ে দেবো। দু'জনকার দেওয়া হবে।"

অনিন্দিতা হাসিমুখে বলিল, "বেশ।"

বৈকালের কাজকর্ম্ম সারিয়া করুণাময়ী একটা রেশমী সূতার আসন বুনিতেছিলেন। অদূরে ছোট খোকা হামা দিয়া খেলা করিতেছে। শ্বশুরের জন্য করুণাময়ী ভেলভেটের আসন তৈরি করিতেছেন। বড়-বড় সাদা পদ্ম আর পদ্মপাতা, মাঝে-মাঝে ছোট-বড় পদ্মকুঁড়ি। ঠিক মাঝখানে জলে পদ্মবন, ইতস্ততঃ কতকগুলি ভ্রমর আর প্রজাপতি ঘুরিয়া-ঘুরিয়া মধু সঞ্চয় করিতেছে। একটা লুব্ধ বক জলে পা ডুবাইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

মেয়েরা ছুটিয়া আসিল। ছোট বলিল, "এই ফুলটা মা তোমায় পরতে হবে। কি সুন্দর ফুল, দেখ।"

মা মুখ তুলিয়া চাহিয়া ঈষৎ হাসিলেন, "আমি আবার ফুল পরবো কিরে?" বড় মেয়েকে বলিলেন, "আয়, তোকে পরিয়ে দিই।"

স্ত্রী

বড়র মাথার চুলে দীর্ঘ বেণী দুলিতেছে। ছোটর মাথার চুল ছেলেদের মত করিয়া ছাঁটা। গত বৎসর টাইফয়েড হইতে সে বাঁচিয়া উঠিয়াছে। সে টাইফয়েড যে হইয়াছিল, তার কারণ ছিল। চারিদিক খোলা—পশ্চিমের এ-সহরে গ্রীষ্মকালে রীতিমত 'লু' চলে। দুপুরবেলা বন্ধ অন্ধকার ঘরে সকলকে দায়ে পড়িয়া আশ্রয় লইতে হয়। খড়খড়ির পিছনে খস্‌খসের মোটা পরদা ফেলা থাকে, চারিদিকে তালপাতার চেটাইএর ঝাঁপ দিয়া বারান্দা বন্ধ করা হয়। সুলতা আর অনিন্দিতা কোনদিন দিনের বেলা ঘুমাইতে পারে না—ঝাপ্‌সা অন্ধকারে কি করিয়া দিন কাটাইবে? সকলে ঘুমাইয়া পড়িলে দু'জনে চুপিচুপি ঘর হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় গিয়া খানিক ঘুরিয়া বেড়ায়। একদিন দুপুরের রৌদ্রে বাতাস যখন তাতিয়া রুদ্র রোষে গর্জ্জন তুলিয়া বারান্দার গায়ের ঝাঁপ ঠেলিতেছিল, তখন তাদের সখ হইল, 'লু' কেমন, দেখিতে হইবে। ক্যাব্‌লা চাকরটা বলে, 'লু' নাকি একরকম ভূত! এই রকম হাওয়া লইয়া সে আসে! লতাপাতা, ছেঁড়া চুলের নুটি, কাগজের ছেঁড়া পাতা—সব তার গায়ে ঠেকিয়া ঘুরিতে-ঘুরিতে ঊর্দ্ধে আকাশে উঠিয়া যায়! সুলতারা যখন সকালে-সন্ধ্যায় আহুরী-নদীর তীরে বেড়াইতে যায়, দেখিয়াছে, 'লু'-ভূতে কত লোককে না রোজ পাইয়া থাকে! কত লোক মরিয়া যায়, কেহ-কেহ বাঁচিয়া ওঠে। মন্ত্র-তন্ত্র ঝাড়-ফুঁক্, সেই সঙ্গে দমাদম্ মাদল বাজিতে থাকে। ভূতে-পাওয়া মানুষটাকে ঘিরিয়া কত লোক নাচে—কি সব বলিয়া চেঁচায়, আরও কত-কি করে, দেখা যায় না। তবে—"আরে বাপ্! আরে বাপ্!" করিয়া চেঁচায়, শোনা যায়। অনিন্দিতাকেও সেদিন যেন ঐ লু-ভূতে পাইল! দুটি দিন দু'জনে ঘরের বাহির হইয়াছিল, তাহার মধ্যে এই কাণ্ড! প্রবল জ্বর আসিল, জ্ঞান

রহিল না, আরও কত কি! সেই ভূতে-পাওয়া লোকগুলার মত সে-ও ছট্‌ফট্‌ করে আর যা-তা বলিয়া চেঁচায়! 'আরে বাপ্‌' বলে না, তবে 'দিদি-দিদি' বলে। কাঁদিয়া-কাঁদিয়া স্নুলতার দু'চোখ ফুলিয়া উঠিল। না খাইয়া, না ঘুমাইয়া তার গলায় ঝিঁক উঠিল, চোখে কালি পড়িল। তারপর অনিন্দিতা সারিয়া উঠিলে বাড়ীতে হরির লুট! সেদিন বাতাসার ঢেউ বহিয়া গিয়াছিল যেন!

মায়ের কথায় দুই বোনই আপত্তি তুলিল। শেষে পাতাসুদ্ধ ফুলটি মায়ের খোঁপায় পরাইয়া দিয়া মেয়েদের আর আহ্লাদের সীমা রহিল না।

—"বড়দি'মণি বড়দি'মণি! কুমার-সায়েব এয়েচে, হাতি চড়তে তোমাদের ডাক্‌চে!" এই বলিয়া নতুন-ঝি আসিয়া দেখা দিল। মেয়েরা সোৎসাহে চলিয়া গেল।

কুমার-সাহেব—কুমার রুদ্রেন্দ্রনারায়ণ এখানকার জমিদার। প্রায় আসেন—হাতি চড়াইয়া, কখনো পাল্কী চড়াইয়া দুই বোনকে বেড়াইয়া আনেন। লোকটি মোটের উপর অমায়িক এবং সামাজিক, মেয়েদের সঙ্গে 'ভাইঝি' সম্পর্ক পাতাইয়াছেন।

এদিন কিন্তু এক নূতন ব্যাপার ঘটিল। দুই বোনকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়া কুমার-সাহেব তাদের হাতে দু'খানা শীলমোহর-করা খাম দিয়া বলিলেন, "গিয়ে তোমাদের মাকে দিও। লুকিয়ে নিয়ে যাও, কেউ না দেখতে পায়।" বলিয়া তিনি হাতি চড়িয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন।

আনন্দনাথের মেয়েদের লুকোচুরি-করা অভ্যাস নাই; কিন্তু কথা শোনার অভ্যাস খুব পাকা। কুমার-বাহাদুরের সতর্ক নিষেধে আশ্চর্য্য বোধ করিলেও কুমার-বাহাদুরের কথা তাহারা রক্ষা করিল। ভিতরে

গিয়া দেখিল, করুণাময়ী খাবার ঘরে বঁটি পাতিয়া শ্বশুরের জন্য ফল ছাড়াইতেছেন। এত লোকজন থাকিলেও, শ্বশুরের খাওয়া-দাওয়ার সব তিনি নিজের হাতে করেন। বাড়ীর নিয়ম। নিজে অসুস্থ থাকিলে, সুলতা এসব ছোট-খাটো কাজ করে—অনিন্দিতা দিদির দেখাদেখি কিস্‌মিস্ বাছিয়া দেয়, ভাঙা বাদামের খোলা ছাড়ায়, আপেল, নাসপাতির টুক্‌রাগুলি জল হইতে তুলিয়া-তুলিয়া শ্বেত-পাথরের মাজা রেকাবে গুছাইয়া রাখে। ভুল হইলে সুলতা শুধরাইয়া দেয়, হাসিয়া বলে, "দূর বোকা! সাদার পর সাদা দিলে কি মানায়? মা যখন ফল সাজান্, দেখিস্‌নি? আপেলের পর আম দিয়ে তারপর নাসপাতি দিতে হয়!"

অনিন্দিতা দিদির কথা শোনে, ফলের টুক্‌রা আস্তে-আস্তে সরাইয়া দেয়, তারপর প্রশ্ন করে, "এইবারে ঠিক হয়েছে, দিদি?"

—"এইবারে!" একটু ভাবিয়া সুলতা বলে, "ওর একপাশে খেজুর, কিস্‌মিস্, বাদাম, পেস্তা দে, আর অন্যধারে দে সরবতী-লেবুর দুটো কোয়া, একটু তবু হল্‌দে-ভাবের রং আছে তো!···হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে! মাঝখানটা খালি রইলো কেন? দেখিস্‌নি বুঝি—মাঝখানে মা সন্দেশ, না হয় চন্দ্রপুলি দেন?"

অনিন্দিতা অপ্রতিভ হয়, বলে, "হ্যাঁ, দেখেছি।"

সুলতার মত করিয়া এ-সব খুঁটিনাটি সে অতটা দেখে না, বয়সে ছোট বলিয়া বটে, তাছাড়া সকলের পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি সমান নয়।

অনিন্দিতা আর সুলতা একসঙ্গে হাতের খাম দু'খানা মায়ের দিকে বাড়াইয়া একসুরেই বলিয়া উঠিল, "কুমার-সাহেব তোমায় দিতে দিলেন।"

বঁটির উপর ফল-ধরা হাত রাখিয়া করুণাময়ী সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মুখ

তুলিলেন, "কি রে ?" তারপর মেয়েদের হাতে শীল-করা খাম দেখিয়া ঈষৎ বিস্ময়ে টুক্‌রা-করা আপেল জলে ফেলিয়া খামখানা লইলেন। একখানার পাত্‌লা শীল মাথার কাঁটা দিয়া খুলিতে-খুলিতে বড়কে বলিলেন, "তুই ততক্ষণ খেজুরের বীচি ক'টা বেছে রাখ্ দিকিন্।"

সঙ্গে-সঙ্গে অনিন্দিতা দাবী তুলিল, "আর আমি ?"

করুণাময়ী সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়াই খামের শীল ভাঙ্গিলেন। খাম খুলিয়া দেখেন, ভিতরে মোটা একতাড়া নোট। বিরক্তিতে করুণাময়ীর মুখ কালো হইয়া গেল। অন্য খামখানা না খুলিয়াই তিনি নিঃশব্দে বঁটি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু অনিন্দিতা ছাড়িবার পাত্রী নয়! দিদি কাজ করিবে আর সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে, তাহা হইতে পারে না! মাকে ঘর হইতে চলিয়া যাইতে উদ্যত দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি কি করবো ? ওমা! কথা কইছো না কেন ? বলো না!"

দ্বারের কাছ হইতে মুখ ফিরাইয়া বিরক্ত-কণ্ঠে করুণাময়ী উত্তর দিলেন, "কি আবার করবি ? কিছু করতে হবে না।"

—"না, তা হবে না, বলে যাও!" অনিন্দিতা মা'র পিছনে ছুটিল।—"বারে, দিদি কাজ করবে, আর আমি বোকা হয়ে বসে থাকবো ? না,—বলো না, কি করবো ?"

মুখ না ফিরাইয়াই মা বলিলেন, "ধান ভান্‌গে যা"—বলিয়াই তিনি চলিয়া গেলেন।

সেইখানে দাঁড়াইয়া অনিন্দিতা ডাকিল, "দিদি!"

—"কিরে ?"

—"মা আমায় ধান ভান্‌তে বলে গেলেন! কোথায় ধান আছে বলে গেলেন না তো! ধান কোথায় পাবো ?"

সুলতা হাসি চাপিয়া গম্ভীর-সুরে জবাব দিল, "কেন, বাজারে গোলায়। সেই যে কেরামৎ একদিন আমাদের দেখিয়েছিল। সেইখান থেকে আন্‌বি, এনে ভান্‌বি।"

অনিন্দিতা ক্রুদ্ধ-কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "কে আন্‌বে? আমি?"

সুলতা কহিল, "তুই ছাড়া আবার কে আনবে, শুনি? তোকে বলে গেলেন, আমাকে তো আর বলেননি যে, আমি ধানের চ্যাঙ্গারী মাথায় করে আন্‌তে যাবো!"

রাগিয়া অনিন্দিতা দিদির কাছে ফিরিয়া আসিয়া ধপ্‌ করিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল, ঝাঁজ দেখাইয়া সবেগে বলিয়া উঠিল, "আমার বয়ে গেছে! ধানের চ্যাঙ্গারী মাথায় করে আমি রাস্তা দিয়ে আস্‌বো? আমি যেন ঘুঁটে-উলি—আমি যেন মেছুনী! না, আমি ধান ভান্‌তে পারবো না।"

সুলতা হাসিয়া উঠিল, "বোকা! ধান বুঝি তুই ভান্‌তে পারিস্! মা রাগ করে তোকে ও-কথা বললেন, তা বুঝতে পারলি নে?"

অনিন্দিতা আরো রাগিল, বলিল, "কেন মা রাগ করলেন? আমি কিছু করেছি যে, মা রাগ করবেন! তুমি কাজ কর্‌বে, আর আমি কিছু করতে পাবো না? বারে!"

সুলতা বলিল, "কেন করতে পারবি না? এইতো তোর এত সব কাজ পড়ে রয়েছে। কর্ না।" বলিয়া পেস্তা-বাদামের বাটিটা সে অনিন্দিতার দিকে ঠেলিয়া দিল।

মায়ের উপর অনিন্দিতার খুব অভিমান হইয়াছে। মুখ ভার করিয়া সে বলিল, "না, আমি কর্‌বো না! কেন, মা তো ওই কাজটা দিয়ে যেতে পারতেন!" অনিন্দিতার চোখ ছলছলিয়া উঠিল!

স্বল্পতা বোনকে বুঝাইয়া বলিল, "মা'র উপর রাগ করিস্‌ নে—কিছু একটা হয়েছে! ঐ খামে কুমার-সাহেব এমন-কিছু দিয়েছেন, যাতে মা খুব বিরক্ত হয়েছেন! তাই ও-কথা বলে বাবার কাছে খাম নিয়ে গেলেন।"

অনিন্দিতা বাদামের খোসা ছাড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিল, ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল, "তা আমি কি করে জান্‌বো? মা কি আমায় সে-কথা বলেছেন?"

বাস্তবিক ব্যাপার একটু গুরুতর। ঐ খাম দু'খানাতে এক হাজার টাকার করিয়া দু'হাজার টাকার নোট ছিল। দ্বিতীয় খাম না খুলিয়াই, তাহাতেও যে ঐ একই বস্তু আছে—অনুমান করা কঠিন নয়! মেয়েদের ভালবাসিবার সুযোগ লইয়া, তাঁহাকে এরূপ অপমানিত করায় করুণাময়ী অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াই নোট হাতে স্বামীর কাছে যাইতেছিলেন, পথে তাঁহাকে পাকড়াও করিল নতুন-ঝি। একেবারে সপ্তমে স্বর তুলিয়া দু'হাত নাড়িয়া বলিল, "এ কেমনধারা বিচার? ক্যাব্‌লা-চাকর, বামুন-ঠাকুর, চাপ্‌রাসীরা, তোমার সোহাগের পুণ্যিঠাকরুণ সব্বাই পেলে দশ-দশ টাকা করে, আর আমি—আমার বেলায় ঢু-ঢু! কেন, আমি কি গতর খাটিয়ে খাই নে? আমি কি বাচ্চা-কাচ্চা ফেলে তোমাদের এই ধাপ্‌ধাড়া গোবিন্দপুরে দুটো পয়সার লেগে আসিনি? কেন, আমাকে এত হেনস্থা? কিসের জন্যে, শুনি?"

করুণাময়ী যেন আকাশ হইতে পড়িলেন! একে তাঁর মন ভারাক্রান্ত—বাহিরে একজন নিছক পর—মেয়েদের হাত দিয়া অতগুলা টাকা তাঁহাকে পাঠাইয়া স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিয়াছে—তাহার মাঝখানে এই মুখরা স্ত্রীলোকটি তাঁহার বিস্ময়ের মাত্রা বাড়াইয়া দিল। তখনি সেখানে দাঁড়াইয়া কঠিন কণ্ঠে তিনি বলিয়া উঠিলেন,

"তুমি পাগল হয়েছো নতুন-ঝি! দশ টাকা করে কে ওদের দেছে? কি এমন হলো হঠাৎ যে, বাড়ীশুদ্ধ লোককে দশ টাকা করে বকশিস্ দেওয়া হলো, আর তোমায় হলো না!"

নতুন-ঝি ঝঙ্কার তুলিয়া বলিল, "আহা, তুমি কেন দেবে গো! তাই কি আমি বলেছি? ঐ কুমার-সায়েব…ঐ বিকেলবেলা হাতি চড়ে এলো না? ওরই কারপরদাজ আমাদের বাড়ীর সব্বাইকে জনে-জনে ডেকে দশটা করে কর্‌করে নতুন টাকা দিয়ে গেল যে! আমায় নাহয় ও-ব্যাটা চেনে না, আমি তো আর তোমাদের পদীর মতন ছেলে কোলে বাহার দিয়ে বেড়াই নে—বাড়ীর মধ্যে থাকি। তা, ঐ গতরখাকি পুণ্যির তো আমার নামটা করা উচিত ছিল। হাত পেতে নিজের গণ্ডাটি তুই বুঝে নিলি—আর-একজনা যে বঞ্চিত হলো, সে-কথাটা একবারও ভাব্‌লি নে! এ কি ধর্ম্মে সইবে?"

করুণাময়ী নতুন-ঝির করুণ বিলাপে কর্ণপাত না করিয়া পুণ্যিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সে আসিয়া টাকা লওয়ার কথা অস্বীকার করিল না। ধমক খাইয়া সোজা জবাব দিল, "আর-জন্মে ধারতো, তাই না, না-চাইতে না-চিন্তিতে দিয়ে গেল! না ধারলে কেউ কারুকে এম্‌নি-এম্‌নি দেয়? কই, দাওনা তুমি আমায় দশটা টাকা এক্ষুনি! অবিশ্যি মাইনে কেটে নয়!"

পুণ্যির অকাট্য যুক্তিতে করুণাময়ী রাগের মাথাতেও না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না। হাসি চাপিয়া গম্ভীর-গলায় বলিলেন, "আর-জন্মের ধার তো তার শোধ হয়ে গেছে। এ-জন্মের ধারটা তুমিও হাতে-হাতে শোধ করে ফ্যালো, টাকাগুলো ফিরিয়ে দাও, আর অন্যদেরও দিয়ে যেতে বলোগে। ও-টাকা এখনি ফেরত দিতে হবে।"

পুণ্যি মুখ ঘুরাইয়া বলিয়া গেল, "ফেরত দেবে? দিলুম তাই! কেন, দিলে কেন? আমরা কি চাইতে গেছলুম? চুরি করেছি? সখ করে ভদ্দর-নোক দিয়েছে, ফেরত দিলে তার মান থাকে কখনো? বুঝেছি, নতুন-ঝি মাগীর কাজ! সাতখানা করে লাগিয়েছে! ওরে দেয়নি কিনা, তাই হিংসেয় জ্বলে মরছে!"

তথাপি সকলের টাকা এক করিয়া যথাস্থানে ফেরত দিতে হইল। আনন্দনাথকে করুণাময়ী সব কথা বলিতে, ব্যাপার তিনি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন। অর্থাৎ হঠাৎ রাগের মাথায় কুমার-সাহেবের হুকুম দেওয়ার ফলে একটা চাকরকে বেদম প্রহার করা হয়, সেই প্রহৃত ভৃত্য তাঁর নামে আদালতে নালিশ করে। সেই মকর্দ্দমা আনন্দনাথের কোর্টে উঠিবে, তাহারই জন্য এই ঘুষ খাওয়ানোর ব্যবস্থা।

আনন্দনাথ সমস্ত টাকা জড়ো করিয়া পাঠাইয়া দিলেন, সেইসঙ্গে লিখিয়া দিলেন, "আপনার এই ব্যবহারই আপনার বিরুদ্ধে সব-চেয়ে বড় প্রমাণ! সত্য কখনও এমন বাঁকা-পথ ধরিয়া চলে না—এ-কথা মনে রাখিবেন।"

মামলার দিন কুমার-সাহেব নির্ভীক-কণ্ঠে দোষ স্বীকার করিলেন। দণ্ডগ্রহণ করিয়া শান্তমুখে বিচারকের উদ্দেশে জোড়-হাতে নমস্কার জানাইয়া কোর্ট হইতে চলিয়া গেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অল্প দিনের জন্য আনন্দনাথ ছোট একটা সহরে বদলি হইয়া গেলেন। মাসখানেকের জন্য। সেখানে যাওয়ার পূর্ব্বে কলেক্‌টার-সাহেব অফিস তদারক করিতে আসিয়া, সস্ত্রীক ইন্‌স্‌পেকসন-বাংলোয় উঠিয়াছিলেন। একদিন সুলতা আর অনিন্দিতা ছোট ভাইটিকে পেরাম্বুলেটারে চড়াইয়া ঝি-চাকরদের সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল—মিসেস্ পিটারসনের সহিত তখন সাক্ষাৎ হয়। মিসেস্ পিটারসনের স্বভাব সাধারণ ইংরেজ-মহিলার মত নয়। স্বামী আই-সি-এস হইলেও এদেশী ভাষায় পণ্ডিত। আনন্দনাথকে সাহেব বন্ধুর মতই দেখেন। আনন্দনাথের পিতার সহিত তাঁর পরিচয় হইল। সে-পরিচয়ে তাঁহার উপর সাহেবের শ্রদ্ধা হইল। সেজন্য এ-পরিবারের সহিত সাহেব ও মেম-সাহেবের কতকটা সৌহার্দ্দ্য জন্মিয়াছে। এবার এখানে আসিয়া হঠাৎ সেদিন মেয়েদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে মিসেস্ পিটারসন্ সুলতাকে বলিলেন, "তোমার মাকে বলো, কাল বিকালে আমি তোমাদের বাড়ী যাবো।" আরও বলিয়াছিলেন, "আমার সঙ্গে মিসেস্ ওয়েক্‌ফিল্ড আছেন, তাঁকেও যেন একটা চিঠি দিয়ে তিনি আসতে লেখেন। তোমার মার কথা আমার মুখে শুনে তিনি ওঁকে দেখতে চেয়েছেন।"

সুলতা বাড়ী ফিরিয়া মাকে বলিল। শুনিয়া আনন্দনাথ হাসিয়া স্ত্রীকে বলিলেন, "তুমি দেখছি ক্রমে পদ্মিনী-নূরজাহান হয়ে উঠ্‌লে! মেম-সাহেবরা তোমার রূপ দেখে মুগ্ধ হয়!" মেয়েরা না শুনিতে পায়, এমনভাবে স্বর মৃদু করিয়া তিনি আরও কি

বলিলেন—শুনিয়া করুণাময়ী সকোপে বলিয়া উঠিলেন, "যাও! ওরকম কথা বল্‌বে তো—"

স্ত্রীকে আরও একটু রাগাইয়া দিবার জন্য আনন্দনাথ বলিলেন, "কি? বল্‌বো তো কি করবে, শুনি? মারবে?"

করুণাময়ী তেমনই আরক্ত মুখে জবাব দিলেন, "ওসব কথা যে বলে, তার মার খাওয়াই উচিত!"

—"সত্যি কথা বললেও মার খাওয়া উচিত? বেশ, আমি পিটারসন্‌কেই সাক্ষী মান্‌বো! দেখি, সে কি বলে, তারপর তখন—"

করুণাময়ী হাত দিয়া স্বামীর মুখ চাপা দিলেন, মৃদু-ঝঙ্কারে বলিলেন, "ফের ঐ বাজে কথা নিয়ে আমায় জ্বালাবে তো বাবাকে বলে দেবো।"

আনন্দনাথ পত্নীর হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া হাসিয়া সকৌতুকে কহিলেন, "তোমার ঐ হাতখানার আমার মুখ বন্ধ করবার ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু যে ভয় দেখালে—বাপ্‌রে! আর নয়। সন্ধি। এখন একখানা চিঠি লিখে বাহক-মারফত আলাউদ্দীনের বরাবর পাঠিয়ে দাও। আর কালকের অতিথি-সৎকারের কি ব্যবস্থা করবে, ভাবো। আমি চললুম।"

প্রথম-শরতের শুভ্রোজ্জ্বল প্রত্যূষে আনন্দনাথরা সপরিবারে পাল্কী চড়িয়া যাত্রা করিলেন।

ও-দেশের পাল্কী বেশ মজবুত আর বড়। ভিতরে বিছানা পাতিয়া শুইয়া আরামে যাওয়া যায়। কিন্তু দূর পথে যাইতে বহুক্ষণ ধরিয়া মানুষ শুইয়া থাকিতে পারে না—বিশেষ অনিন্দিতার মত মেয়ে। একদণ্ড পা মেলিয়া বসা তার কোষ্ঠিতে লেখে নাই। সেজন্য নতুন-ঝি দিন-রাত আফসোস করিয়া মরিতেছে।

স্ত্রী

দুই বোনে এক পাল্কীতে চলিয়াছিল। প্রায় বারো ঘণ্টার পথ—ঘণ্টাখানেক পর হইতেই অনিন্দিতার প্রশ্নে-প্রশ্নে সুলতার প্রাণ যায়-যায় হইয়া উঠিল!—কতক্ষণ হইল? ক'ঘণ্টা বাকি? আজকের ঘণ্টাগুলো এত দেরী করে হচ্ছে কেন? ওরকম বিশ্রী দূরে বাবা কেন বদলি হলেন? বাবা কেন সাহেবকে বলে বদলি বন্ধ করে দিলেন না? আরও কত কি! তার সব কথার হিসাব থাকে না। সুলতা বয়সে বড়, তার উপর অত্যন্ত ঠাণ্ডা-স্বভাবের মেয়ে। প্রকৃতিও তার অনেকটা ভাবপ্রবণ। এই শরৎ-প্রাতে পাল্কী-যাত্রা—পাল্কী পথ-রেখা ধরিয়া চলে না। মাঠ-বাট ভাঙ্গিয়া, বর্ষায় পলি-পড়া পিছল ধান জমিতে পা টিপিয়া-টিপিয়া, কোথাও মাঠে-জমা জলে প্রায় হাঁটু ডুবাইয়া বাহকরা নানারকম ধ্বনি করিতে-করিতে চলিয়াছে। চারিদিকে সুদূরপ্রসারী ধানের ক্ষেত নবীন অঙ্কুরে শ্যামল শ্রী ফুটাইয়া নয়ন-মন মুগ্ধ করিতেছে। আকাশে গাঢ় নীল দিক্‌চক্রবালে সবুজের নিবিড়তায় মসীকৃষ্ণ রেখা—যেন সেই নীলিমার প্রান্তে কালো পাড়ের মত দেখাইতেছে। তার পর হইতেই সবুজ মখমলের ঘন-পুরু গালিচার মত অপরূপ, অফুরন্ত ঢালা সবুজ! কিন্তু এ-সবুজ প্রকৃতির করুণার দান নয়! মানুষ হল চালাইয়া লাঙল দিয়া ধরণীর মাতৃ-বক্ষ দীর্ণ-বিদীর্ণ করিয়া প্রাণ-অমৃত গ্রহণ করে—এ-সবুজ সেই প্রাণ-অমৃতের সবুজ ধারা! অথচ সেই নির্ম্মম অত্যাচারের প্রতিদানে মানুষ লাভ করে মাতৃ-হস্তের অপর্য্যাপ্ত সবুজ সুধা—ফলমূল। খনি খুঁড়িয়া খাত খুঁড়িয়া মায়ের অবশেষ পুঁজিপাটাও মানুষ লুটিয়া লয়। কূপ-তড়াগ কাটিয়া মাতৃ-স্তন্যের ক্ষীরধারা ইচ্ছামত মানুষ পান করে।

পথের মাঝখানে ছোট-ছোট দুটি নদী পার হইতে হইল। পাল্কীসুদ্ধ খোলা পারানী-নৌকায় তুলিয়া পার হওয়া। পাহাড়ী-

নদী যেমন হয়—এম্‌নিতে সারা বৎসর প্রায় জল থাকে না—বালি-কাঁকরের চড়া ছ'পাশে শ্মশানের মত ধূ-ধূ করে; বুকের মাঝখানে খানিকটা জল জমিয়া থাকে। সে জল এত কম যে, শীর্ণ চামড়া-ঢাকা বুকের জার্ণ-পঞ্জর যেন! সেই স্বল্প-সলিলের নীচে মুড়ি-পাথরগুলা পর্য্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়। এখন সে অবস্থা নয়। বর্ষার গৈরিক জলরাশিতে পরিধি হারাইয়া ছ'পারের শস্যক্ষেত্র বহুদূর পর্য্যন্ত কুক্ষিগত করিয়া লইয়াছে। নদীর বুকে অথৈ জল! তীরে জলের ভিতর হইতে মাথা তুলিয়া শন-ফুল মৃত্থ বাতাসের দোলায় তালে-তালে নাচিতেছে। জলের মধ্যেও বাতাসের দোলা লাগিয়া মৃত্থ-মন্দ হিল্লোলের সঞ্চার। নদীর ধারে পুরাতন একটা বটগাছ, তার তলায় বসিয়া রাখাল-ছেলে বাঁশের বাঁশি বাজাইতেছে। ইতস্ততঃ কতকগুলি গোরু-বাছুর চরিয়া বেড়াইতেছে।

সুলতা একাগ্র মনে এই ক্রম-পরিবর্ত্তিত দৃশ্য দেখিতেছে। বেলা বাড়িতেছে। শরতের মেঘ-ফাটা রৌদ্র মুক্ত-প্রকৃতির বুকে যেন অঞ্জলি-অঞ্জলি সোনার গুঁড়া ছড়াইয়া দিতেছে। চারিদিকের নানা ক্ষেতের উপর সেই সোনালী রং যেন তাজা জলুশ-করা বেনারসী সাড়ীর মত জ্বলজ্বল করিতেছে। পাকা ধানের ঈষৎ হরিদ্র-পীতাভ শীর্ষ বাতাসে ছুলিয়া সেই বেনারসী সাড়ীর কল্কাদার আঁচলার মত ঝল্‌মল্‌, ঝিল্‌মিল্‌ করিতেছে। মধ্যে-মধ্যে ছু-একটা ঝোপে বসিয়া জানা-অজানা পাখী সুর তুলিয়াছে। জলের ধারে একটা মাছরাঙা পাখী ছুম্‌ড়ি খাইয়া জলে ঠোঁট ডুবাইয়া মাছ ধরিতে ব্যস্ত দেখিয়া অনিন্দিতা চেঁচাইয়া উঠিল।

—"দিদি! ছাখো-ছাখো, কি-রকম লম্বা-ঠোঁট পাখী! এ-পাখী এর আগে তুমি কখনো ছাখোনি!"

সুলতা কহিল, "ও-পাখী আমি দেখেছি রে। ওর নাম মাছ-রাঙা—মাছ ধরছে, খাবে বলে।"

অনিন্দিতার বিস্ময়ের সীমা নাই! সে বলিল, "তুমি এ-পাখী দেখেছিলে আগে?"

—"দেখেছি। আমি যে তোর চেয়ে বড়—তোর চেয়ে তাই বেশী কিছু-কিছু দেখেছি। তুই যখন বড় হবি, তখন কত কি দেখবি! দেখেছিস, কি লম্বা ঠোঁট!"

মাছরাঙা ততক্ষণে জল হইতে কি একটা খুঁটিয়া বাহির করিয়াছে।

দুপুরবেলা রোদের তেজ খুব বাড়িয়া উঠিল। সুলতা মুখ বাহির করিয়া দেখে, অন্য সব পাল্কীর দরজা বন্ধ। একখানায় খোকাকে লইয়া মা আছেন। বাবা আর দাদু আলাদা দুখানা পাল্কীতে। দুজন ঝি এক-পাল্কীতে। সুলতার হঠাৎ হাসি পাইল। —"আচ্ছা, ওরা দুটোতে যদি সারা পথ ঝগড়া করতে-করতে যায়? দু'জনে একটুও বনিবনা হয় না!"

অনিন্দিতার সামনে এ-ধরণের কথা একবার বলিলে হয়! তার ভালোবাসার নতুন-ঝি, দুর্দ্দান্ত যমুনার সঙ্গে একা পড়িয়াছে! ঝগড়া নাহয় হইল, কিন্তু যমুনা যে যখন-তখন নতুন-ঝিকে শাসায়, বলে, "আমার সঙ্গে বড় নাগ্‌তে এয়েচো, দেবো মেরে হাড় ভেঙে!"—যদি তাহাকে একা পাইয়া তাই করে!

অনিন্দিতার ভাবনা হইল। সে ডাকিল, "দিদি!"

—"কেন?"

—"আচ্ছা, মতির সঙ্গে নতুন-ঝিকে এক পাল্কীতে পুরে দিলেন, ও যদি ওকে মারে?"

সুলতা জিজ্ঞাসা করিল, "কে কাকে মারবে ?"

—"মতি যখন-তখন নতুন-ঝিকে বলে, মেরে হাড় ভেঙে দেবো। যদি দেয় ? সত্যি, ওকে নামিয়ে নিলে হয় না ?"

সুলতা হাসিয়া উঠিল, "তুই একটা পাগ্‌লী ! তোর নতুন-ঝি ভারী লক্ষ্মী কিনা, মার খেলে মার ফিরিয়ে দিতে জানে না !"

এ-কথায় অনিন্দিতা যেন ভরসা পাইল না। সে কেমন উদাস-আকুল চোখে চাহিয়া রহিল।

সুলতা বলিল, "তুই ক্ষেপেছিস ! তা বুঝি পারে ? দাদু, বাবা, মা—সকলে সঙ্গে। ভয় নেই ওর,—মারলে বকুনি খেতে হবে ? তাছাড়া সব সময়েই তো ওরা ঝগড়া করে না—দু'জনে ভাবও তো হয় দেখেছি।"

অনিন্দিতা যেন বাঁচিল ! নতুন-ঝিকে লইয়া তার অস্বস্তির যেন শেষ নাই ! তাকে রাগাইবার জন্য ওই নতুন-ঝিকে লইয়া কে না তাহাকে ক্ষেপায় ? বামুন-ঠাকুরের পাণ আনিয়া দিতে হইবে, রাজী না হইলেই, বলিবে, রাত্রে আজ নতুন-ঝির ভাগের মাছখানা বিড়ালকে দিবে ! চাপরাশী কাগজপত্র আনিয়াছে, বাবুর কাছে খবর দিতে ছোটদিদিকে মিনতি জানাইল, ছোটদিদি বলিল, "আমি এখন যেতে পারবো না।" অমনি সে বলিয়া বসিল, "থাক্, আমি আজ পুলিশে খবর দেবো, নতুন-ঝি সেদিন মা'র ভাঁড়ার থেকে আচার চুরি করেছিল।" আর রক্ষা আছে ! ছোটদিদি সব ফেলিয়া তখনি ছুটিবে।

বেলা পড়িয়া গিয়াছে। বর্ষায় শোণ-নদ দিগন্তবিস্তৃত মূর্ত্তি প্রসারিত করিয়া গভীর গর্জ্জনে ছুটিয়া চলিয়াছে। এপার-ওপার দেখা যায় না। বর্ষার রাঙা জল চারিদিকে ছলছল করিয়া

উঠিতেছে। ঢেউএর মাথায়-মাথায় সাদা ফেনার মালা। অপরাহ্নে অস্ত-সূর্য্যের রক্তচ্ছটা সেই গেরুয়া-স্রোতের উপর রক্তরাগ ঢালিয়া তাহাকে আরও অপরূপ করিয়া তুলিয়াছে।

রুদ্ধদ্বার পাল্কীর মধ্যে বসিয়া শোণের উন্মত্ত গর্জ্জনকে ঝড়ের শব্দ ভাবিয়া দু'বোন পাল্কীর দ্বার আরও চাপিয়া বন্ধ করিল। একটু-একটু ভয় না করিতেছে, এমন নয়।

—"এ কি, তোমরা দোর বন্ধ করে রয়েছো! এমন সব দেখছো না?" বলিয়া দাদু নিজের হাতে পাল্কীর দরজা খুলিয়া দিলেন।

শোণের উপর পণ্টুন-ব্রীজ, একসঙ্গে সব পাল্কী পার করা হইবে না, তাই নদীর তীরে পাল্কী নামানো হইবে। দাদু পাল্কী হইতে নামিয়া আসিয়াছেন।

মুক্ত দ্বার-পথে যে অপরূপ দৃশ্য চোখে পড়িল, পূর্ব্বে তেমন কেহ কখনও দেখে নাই!

পাল্কী হইতে নামিয়া চারিদিক্ দেখিয়া দাদুর হাত ধরিয়া অনিন্দিতা বলিল, "এ কি দাদু—একেই বলে সুমুদ্দুর?"

সুলতা হাসিয়া উঠিল, "শুনচেন দাদু—অনি কি বোকা! এখানে কখনো সুমুদ্দুর হতে পারে?—তোকে না সেদিন ম্যাপ দেখালুম, সুমুদ্দুর কোথায়—এর মধ্যেই ভুলে গেছিস্!—হ্যাঁ দাদু, এই শোণ-নদ আমাদের দেশের নদীর চাইতেও ঢের বেশী চওড়া—নয়?"

—"প্রায় দেড়গুণ চওড়া। এর উপর এই পুল দেখ্‌ছো, এবার আমরা ঐ পুলের উপর দিয়ে ওপারে যাবো।"

সুলতা বলিল, "ও, ওপারে বুঝি বারুণ? দাদু! দাদু! কিরকম উঁচু হয়ে ঢেউ হচ্ছে দেখুন!"

অনিন্দিতা একটু খাটো হইয়া গিয়াছে। দেশের নদীর মাপজোপ

ছাড়িয়া সে-নদীর চেহারাও তার মনে পড়ে না! আজ প্রায় তিন বৎসর সে এই সব দেশে আছে—শিশুকালের সব-কিছু মনে থাকে না! সে বলিল, "তাই জন্তেই তো আমার মনে হয়েছিল সুমুদ্দুর। 'উত্তাল তরঙ্গময় এ-মহাসাগর'—সেদিন দাহুর কাছে পড়লুম না রামায়ণে! হ্যাঁ দাহু, এ-নদীতে সেই রকম 'উত্তাল তরঙ্গ' হচ্ছে না তো!"

আদর করিয়া তাহাকে একটু কাছে টানিয়া দাহু বলিলেন, "হচ্ছেই তো।" তারপর একটু থামিয়া আবার বলিলেন, "সে-তরঙ্গে আর এ-তরঙ্গে অনেক তফাৎ আছে দিদি! যখন সমুদ্র দেখবে, তখন বুঝতে পারবে।"

—"আচ্ছা।" বলিয়া অনিন্দিতা দাহুর বাহুর উপর হেলিয়া পড়িল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিদায়োন্মুখ বর্ষার সজল সবুজ-শ্রী দিকে-দিকে ছড়ানো। আকাশে নীলিমার অঙ্গে-অঙ্গে নবনা-কোমল শুভ্র মেঘমালা আর বাগানে অসংখ্য শুভ্র রজনীগন্ধা। সুলতা আর অনিন্দিতা যেন আনন্দে দিশাহারা! প্রায়-জনশূন্য এক মাঠের মধ্যে একই পরিচিত গৃহে এক-নিয়মে দিন কাটিতেছিল। প্রত্যহ সেই মাঠের বুকচেরা লাল কাঁকরের পথে বেড়াইতে যাওয়া, কখনো সরু আহ্নরী-নদীর ধারে, কখনো বাজারের দিকে। সে বাজারই-বা কতটুকু! বারো মাস সেখানে আনাজ-তরকারীও তেমন পাওয়া যায় না। ময়রাদের দু-একটা দোকানে পেঁয়াজের ফুলুরী, ভুট্টার খই, গুড়ে-পাক-করা গজা আর লাড্ডু। ভুজাউলির দোকানের কাছ দিয়া যাওয়ার সময় বেশ সোঁদা-সোঁদা গন্ধ পাওয়া যায়; ছোলা মটর চিঁড়া আর চাল ভাজিতেছে। অনিন্দিতার লোভ হয়, কিন্তু সে-লোভ দমন করা ছাড়া যেখানে উপায় নাই, সেখানে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারে না। বাড়ীর কড়া হুকুম তার জানা আছে। আর এখানে নূতন কত কি! ঐ জলভারে উছলিয়া-পড়া নদী। নদীর জলে কি স্রোত! বাড়ীতে বসিয়াও দূর হইতে নদীর কত মূর্ত্তি না চোখে পড়ে! সূর্য্যের উদয়-গৌরবকে গোলাপের মালায়-মালায় যেন পুষ্প-বাসর রচনা করিয়া দেয়। দুপুরে তীক্ষ্ণোজ্জ্বল রৌদ্রে সুবর্ণময়ী বলিয়া মনে হয়—আবার অপরাহ্ণু গোধূলির রক্তচ্ছটায় সফেন তরঙ্গ স্তবকে-স্তবকে বিশ্ব-জননীর চরণ-পূজার জবার অঞ্জলির মত দেখায়। নদীর বুকে তীক্ষ্ণ-স্বরে বাঁশী বাজাইয়া প্রত্যহ একখানা করিয়া ষ্টীমার যাতায়াত করে। মহাজনী নৌকা কতদূর হইতে মাল লইয়া যায়।

সুলতা চুপ করিয়া বসিয়া দেখে। দেখিতে-দেখিতে মন কোথায় যেন উধাও হইয়া যায়। সন্ধ্যায় যেদিন চাঁদ ওঠে, নদীর বুকে জ্যোৎস্না যেন গলা-সোনার মত ঝক-ঝক করিতে থাকে। বাতাসে মাঝে-মাঝে ঢেউ ওঠে—মনে হয়, সোনালী জরি-ঢালা সাড়ীতে সোনা-মাণিকের বুটী তোলা হইতেছে যেন। দেশের নদীর সঙ্গে এ নদীকে পাশাপাশি রাখিয়া সুলতা মনে-মনে তুলনা করে।

সুলতার ভাবুক-মন তাই কি ভালো করিয়া ভাবিবার অবকাশ পায়? যে ছোট বোন তার পিছনে লাগিয়া আছে! "ঐ যে সব মহাজনী নৌকা যায়, আচ্ছা দিদি, ওরা কোথায় যাচ্ছে? কেন যাচ্ছে? কি আছে ও-নৌকায়?"—এ-সবই তার জানা দরকার। অনিন্দিতা জানে, পৃথিবীতে এমন কিছু নাই, সুলতা যাহা জানে না। সুলতাকে তাই অনেক-কিছু কল্পনা করিতে হয়। ভূগোলের একটা ধারণা মোটামুটি আছে, কিন্তু সে-ধারণা লইয়া অনিন্দিতার এই হাজার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না; অথচ জবাব তাকে দিতেই হইবে! প্রথম-প্রথম সে দাদুর কাছে ছুটিত, কিন্তু সর্ব্বদাই তাঁকে বিরক্ত করা চলে না, দাদু বেকার লোক নন,—এখন নিজে যা-হোক একটা উত্তর দেয়। বেনারস হইতে, এলাহাবাদ হইতে, গাজিপুর হইতে, আরা হইতে চালানের খবর টপ্‌টপ্‌ করিয়া সুলতা বলিয়া যায়। আর চালানী-বস্তুর নাম করিতেও বাধে না—গম তিসি সরষে মসিনা ইত্যাদি। নীচের দিক হইতে চালানে শুধু চালের কথা বলিয়াছিল, অনিন্দিতার পছন্দ হয় নাই।—আর-কিছু আসে না কেন? ডাল না হইলে ভাত কি দিয়া খাওয়া হইবে—ভাবিয়া অনিন্দিতা কূল পায় না।

বারুণের বাড়ীখানি বাংলো-প্যাটার্ণের হইলেও খুব বড় এবং

এ-বাড়ীতে অনেক ঘর। বাগানও তার উপযোগী এবং সুরচিত। মাঝখানে বাঁধানো চাতালটি বেশ-বড়। সেই চাতাল ঘিরিয়া গোল-ভাবে বসানো রজনী-গন্ধা আর জিনিয়া-ফুলের ঝাড়গুলি যেমন সতেজ, সে-সব ঝাড়ে তেমনি অজস্র ফুল। বিশেষ অত রংএর আর অত বড়-বড় জিনিয়া এর আগে দেখা ছিল না! দু-বোনে বাগান ছাড়িয়া একদণ্ড নড়িতে চায় না! বাগান ঘুরিয়া যত রকমের চারা গাছ আর ফুলের বীজ পাওয়া যায় লইয়া তল্পী বাঁধে, সেখানকার বাগানে এই সব বসাইতে হইবে। চারাগুলি মাটির ভাঁড়ে-ভাঁড়ে মাটি দিয়া পুঁতিয়া রাখা হইতেছে। দিনে দু-চারবার জল ঢালিয়া তাদের বাঁচাইবার প্রাণপণ চেষ্টা চলে।

কিন্তু অসহিষ্ণু অনিন্দিতার জ্বালায় কিছু হইবার যো আছে? চারাগুলি যেই লাগিয়া আসিতে আরম্ভ করে—দিদির মুখে শুনিবামাত্র অনিন্দিতা চুপি-চুপি আসিয়া চারাগুলিকে মাটি হইতে উপড়াইয়া তাদের শিকড় গজাইয়াছে কিনা দেখিয়া হাসিমুখে দিদিকে খবর দিতে যায়। দিদি কি করিবে? খুব রাগ করে, তবে বোনটির কান্নার ভয়ে তিরস্কার করা ঘটিয়া ওঠে না। শুধু 'বেশ করেছো হনুমানী! যেমন তোমার বুদ্ধি!' এর বেশী আর-কিছু বলে না। ক'দিনের এত পরিশ্রম ব্যর্থ করিয়া দেওয়াতে সে খুবই দুঃখিত হইয়াছিল, কিন্তু সত্য তত্ত্ব জানিতে পারিয়া অনিন্দিতা যখন কাঁদিয়া ফেলে, তখন তার গভীর স্নেহ-ভরা মন মুহূর্ত্তে জল হইয়া যায়। তাড়াতাড়ি তাহাকে কাছে টানিয়া চোখ মুছাইয়া সান্ত্বনা দেয়, "যাক্‌গে, চ আমরা আবার গাছ খুঁজে নিয়ে আসি। বর্ষায় চারা-গাছের অভাব আছে নাকি!"

খোকা-ভাইটি আজকাল টলিয়া-টলিয়া দু-এক পা চলিতে পারে। পাতলা নরম কালো-কালো চুলে মা চূড়া বাঁধিয়া তাহাতে ময়ূর-পাখা

গুঁজিয়া দেন, সুলতা হাতে তালি দিয়া সুরে আবৃত্তি করে, "নাচত মোহন নন্দ-দুলাল !"

খোকা দিদিকেই চায় যেন ! খোকার উপর অনিন্দিতার অভিমান বড় কম হয় না, সে মুখ ভার করে। সুলতা দেখে, দেখিয়া জোর করিয়া খোকার হাত ধরিয়া অনিন্দিতার কপালে ঠেকাইয়া হাসিয়া সে বলে, "খোকা বলো তো—ছোদ্দি তি—"

খোকা দিদিকে অগ্রাহ্য করিতে পারে না—সঙ্গে-সঙ্গে বলে, "তোদি, তিই—"

অনিন্দিতা খুশী হইয়া চুমা খাইয়া খোকাকে বিব্রত করিয়া তোলে, খোকা আবার বিরক্তিতে ভুরু কোঁচ্‌কায়, সুলতাকে নালিশ জানায়, "তোদি, নাঃ, নিন, দুতুঃ।"

দুই বোনে খোকাকে লইয়া খেলা করিতেছিল, ভিতর হইতে মা ডাকিলেন, "লতা, অনি—তোরা নেয়ে-টেয়ে নে, বাবার চান করা হয়ে এলো যে। খোকাকেও তেল মাখাবে, মতিকে ডেকে ওকে দিয়ে দে।"

—"যাই মা !" বলিয়া সুলতা ভাইকে কোলে তুলিয়া দাঁড়াইল। অনিন্দিতা তার আগেই দৌড় দিল। সে যত অভিমানী, যত চঞ্চল, সুলতার স্নেহ ততই যেন উপছিয়া ওঠে ! তার হাত-পা অশান্ত। কাজ করিবার আগ্রহ যত, অকর্ম্ম করার পটুত্বও ততখানি। সুলতা সর্ব্বদা ব্যস্ত হইয়া থাকে, সে কিছু করিতে গেলেই সঙ্গে যায়—বাধা দিয়া তাহাকে নিরুৎসাহ করিতে পারে না—শুধু স্নেহভরা চোখে দেখে—তার আত্মমর্য্যাদা বাঁচাইয়া তার কাজে সাহায্য করে। এইটুকুই সুলতার বৈশিষ্ট্য। নিঃশব্দে সে তার যথা-কর্ত্তব্য সম্পাদন করে। যশের আকাঙ্ক্ষা, বাহবা পাওয়ার আগ্রহ তার মোটে নাই।

নিজেকে ঢাকিয়া রাখিয়া পরের কাজ করিয়া দেয়। অনেক সময় কে করিল, না জানিয়া লোকে তার সাক্ষাতেই অপরের সুখ্যাতি করে; সে বেশ প্রশান্ত মুখে শোনে, প্রতিবাদ করা দূরে থাক, তার মুখের একটি রেখারও পরিবর্ত্তন হয় না!

অবশ্য অনিন্দিতা উপস্থিত থাকিলে সত্য কথা তখনই প্রকাশ পায়। এই অসহিষ্ণু-প্রকৃতির মেয়েটি নিজের কৃতিত্ব যেমন লুকায় না, অপরের প্রতি অবিচারও তেমনি সহ্য করে না। এই স্পষ্টবাদিতা এবং অন্যায়ের প্রতিবাদের জন্য দাস-দাসী-মহলে একমাত্র নতুন-ঝি ভিন্ন অপর কাহারও সে প্রিয় হইতে পারে নাই। সবাই একবাক্যে বলে, "মেয়ে তো বড়দি'মণি! যাকে মেয়ে বলে!" আবার নতুন-ঝির প্রতিদ্বন্দ্বিনী মতি বলিত, "ছোড়দি' তো নয়, যেন ফোঁশ কেউটে!"

বারুণের দিনগুলি প্রথম শরতের সোনালী-রৌদ্রের কিরণ-দীপ্ত বিশালকায় শোণ-নদের প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ গর্জ্জন মুখর, শ্যামশষ্পাচ্ছাদিত মাঠ এবং শুভ্র রজনীগন্ধা ও বিচিত্র বর্ণের জিনিয়া-ফুলের প্রাচুর্য্যে-ভরা উদ্যানের মধ্যে বিচিত্র দিনগুলি যেন গন্ধর্ব্বলোকের স্বপ্ন-মায়া আনিয়া দিয়াছে। দাদু, দিদি, খোকা আর মা-বাবার মধ্যবর্ত্তী হইয়া অনিন্দিতার এবং এই সমস্তর সঙ্গে প্রকৃতির বিচিত্রতাকে কেন্দ্র করিয়া সুলতার দিন সুখে ও শান্তিতে কাটিতেছিল। কাব্যময় পরিস্থিতির মধ্যে তার ভাবপ্রবণতা যেন গতি লাভ করিল। এইখানেই সে প্রথম কবিতা লিখিতে শিখিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আনন্দনাথ তিন মাসের ছুটি লইয়া বাড়ী আসিয়াছিলেন। ছুটি শেষ হইবার কাছাকাছি একটা জেলার সদর নবনগরে বদলি হইলেন। বেশী দূরে যাইতে হইল না বলিয়া সকলেই একটু খুশী হইলেন—সেখান হইতে শনিবার-শনিবার বাড়ী আসা চলে। ট্রেনে ক'ঘণ্টা আসিয়া তারপর গোরুর গাড়ী। ঘোড়ায় চড়া অভ্যাস আছে বলিয়া আনন্দনাথের এ-পথটুকু আসিতে অসুবিধা নাই। তবে, জায়গাটায় শরৎ-হেমন্তে ম্যালেরিয়া জ্বরের ভয়, তাই স্ত্রী-পুত্র-পরিবার বাড়ীতে রহিল।

প্রথম যেদিন নবনগরের বাড়ীতে আসিল, অনিন্দিতা অবাক হইয়া গেল! যখন বাড়ী ছাড়িয়া যায়, তখনকার কথা তেমন মনে পড়ে না। তু'একজন মানুষের কথা একটু-একটু মনে পড়িত, ঘরকরণার চেহারা অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ফটকে গাড়ী ঢুকিতেই সে বিস্ময়ে চমকাইয়া উঠিল! এ কি, এ কোথায় আসিল? কুমার রুদ্রেন্দ্রনারায়ণের বাড়ী না কি? না তো! তাঁর বাগানে এত-রকম গাছ, এত-সব লতাকুঞ্জ, তরুলতা-জড়ানো বাঘের ঘর, হরিণের ঘর ছিল না! ময়ূরের কেকা শুনা যাইত না! তাছাড়া পুরাপুরি তিন দিন ধরিয়া রাত্রে ডাক-বাংলোয় থাকা—দিনে সারাদিন ঘোড়ার গাড়ীতে জঙ্গলের ভিতর দিয়া পথ চলা!—তারপর সেই শালের জঙ্গলের পর পাহাড়ে-ঘেরা সহরের বুকের উপর দিয়া আসিয়া ট্রেনে চাপা। কত-রকম কত-কি দেখিতে-দেখিতে আসা—চোখ বাহিরের দিক হইতে ফিরিতে চাহিত না!···রেল-লাইনের তু-ধারে টেলিগ্রাফের তারের উপর নীলকণ্ঠ পাখীর দর্শন পাইয়াছিল বারংবার। ছোট-বড় পুল, গভীর-অগভীর জলস্রোত, মধ্যে-মধ্যে পদ্ম, শালুক,

কুমুদ-কহ্লারের শোভা—অমন সব সুন্দর ফুলের পাশ দিয়া যাওয়া, অথচ একটিও লইতে না-পারার জন্য আপসোস ; এ-সবই সত্য ! স্বপ্ন নয় ! তবে—এই সুদৃশ্য বৃহৎ অট্টালিকা কুমার-সাহেবের হইবে কেমন করিয়া ? এ-বাড়ী তাদেরই বটে ! দিদি যে কতবার গাড়ী-বারান্দার থামের মাথায় পক্ষীরাজদের গল্প করিয়াছে, সেই জোড়া-জোড়া পক্ষীরাজ ঐ দুটা থামের মাথায় বসিয়া আছে ! আর ঐ খোলা দরজাগুলা দিয়া দেখা যাইতেছে সুবর্ণবতী নদী। নদীর বুকে কেমন সব ছোট-ছোট নৌকা ! শোণ-নদীতে এত ছোট নৌকা দেখা যায় না। সে নদী বেশী বড় বলিয়া বোধ হয়।

এখানকার অভিনবত্বে অনিন্দিতা যেন অস্থির হইয়া পড়িল ! দেখিবার কত-কি জিনিষ—হাতে তুলিয়া দেখিতে ইচ্ছা করে। প্রশ্ন করিয়া বুঝিবার মত জিনিষেরও অন্ত নাই। অথচ দিদি এখানে পা দিয়াই যেন এই প্রকাণ্ড বাড়ী আর বিপুল লোকারণ্যের চাপে কোথায় চাপা পড়িয়া গেছে ! তার আশেপাশে সমবয়সী ও অসমবয়সী অনেক ছেলেমেয়ে সর্ব্বদা ভীড় করিয়া আছে। এরা সবাই তার আপন—দাদা, দিদি, ভাই, বোন ; অথচ সে কাহাকেও চেনে না। উহাদের মধ্যে যারা বয়সে বড়, তারা এত-সব পুরানো কথা বলিতেছে—যে-সব কথা দিদির মুখেও সে কখনো শোনে নাই। এখানে থাকিতে নাকি, কবে কার সঙ্গে তার আড়ি হইয়াছিল, কার সঙ্গে বেশী ভাব ছিল—কোন্ চৌকাঠে হোঁচট খাইয়া পড়িয়া তার চিবুক কাটিয়া গিয়াছিল—সে-দাগটা এখনও আছে না কি, কেহ দেখিতে চাহিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে উপদেশ দিলেন, "অমন করে নাচতে-নাচতে চলো না —ছুটফটে হয়ো না।"

উপদেশ অনিন্দিতার ভালো লাগিল না। সবে এই আজ এখানে আসিয়াছে। এত-বড় বাড়ী—বাগানটাও কি প্রকাণ্ড !

তার উপর ঐ নদী। ঘরগুলায় প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড কাপড়ের তৈরী ঝুলির মধ্যে ডালপালাওয়ালা কি সব কড়িকাঠ হইতে ঝুলিয়া আছে। বাতাসে দুলিতে-দুলিতে শব্দ হইতেছে—টুং-টাং, টুং-টাং। কি ও? কাঁচের জিনিষ কিন্তু, বড়-বড় কাঁচের ঝালরের মত একটু-একটু কি-সব দেখা যায়। বড় হল-ঘরে মেহগনি-কাঠের কতকগুলা আলমারি—ভিতরে কি-সব ঝকঝকে বাঁধানো বই! ওখানে মোটে একটি ছোট বুককেশ ছিল। বুক পর্য্যন্ত মানুষের মাপের কি সুন্দর কতকগুলো ছবি! কোনোটা বসা, কোনোটা দাঁড়ানো! আর তিন-চারিটা ঘরে পুরু কার্পেট, শ্বেতপাথরের টেবিল, টেবিল ঘিরিয়া মেহগনি-কাঠের কৌচ-কেদারার সার—সেগুলো আবার গোলাপী সবুজ সাটিনে মোড়া, রেশমের পাক-দেওয়া দড়ির বাঁধন আবার বোতাম-আঁটা! কোনো ঘরে বিচিত্র ছিটের ঘেরাটোপ পরানো বড়-বড় কৌচ, সোফা। একটা ছোট ঘরের মাপে কি একটা আছে, দাদা বলিল, "এই, পিয়ানো খুলছিস কেন? বন্ধ করে দে, ছোটমামা দেখতে পেলে বকবেন।" অনিন্দিতা দেখিল, মায়ের হার্শ্মোনিয়মের মতই ওর মধ্যে সাদা-কালো 'রিড', কিন্তু আরও কি-সব তার-টার আছে! দেখিবার ইচ্ছা থাকিলেও সে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না, 'ওগুলি কি!'

নূতনের আকর্ষণ খুব বেশী হয়! অনিন্দিতা এ-বাড়ীতে আসিয়া যতই সঙ্কোচ বোধ করুক, দিদি কিন্তু নূতন বন্ধুদের সঙ্গে বেশ মিলিয়া আছে। এজন্য দিদির উপর তার যেমন অভিমান, দিদির এই বন্ধুদের উপর তেমনি হিংসা মনে জাগে! মা বা দাদু সকলেই যেন এখানে তার নাগালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন! কাহাকেও সে আর আগেকার মত তেমন করিয়া পায় না! এমন কি, খোকা পর্য্যন্ত! নতুন-ঝিরও এখানে কাজ বাড়িয়াছে! তাছাড়া সকলেরই বেশ সঙ্গী মিলিয়াছে। সে-ই শুধু একা।

তারপর এখানে আর-এক বিপদ! তার বিদ্যাবুদ্ধি যে না থাকার মধ্যে—এ-খবর ইতিমধ্যে সমবয়সী-মহলে চাউর হইয়া গিয়াছে। ইসারা-ইঙ্গিত সে বোঝে না—কেহ ঠাট্টা করিলে, হয় রাগ করে, নয় কাঁদিয়া ফেলে। রাগ হইলেই বলে, "বাবাকে বলে দেবো।" যদি কেহ বলে, "এখানে বাবা কোথা?" অমনি বাবার জন্য মন কেমন করে, সে কাঁদিতে সুরু করে। কিন্তু এরা তার দিদি নয় যে তার কান্না দেখিয়া দুঃখ পাইবে! এত-বড় মেয়েকে ও-কথায় কাঁদিতে দেখিয়া ইহারা যেন মজা পায়! কেহ বলে, "ছিঁচ্‌কাঁদুনী!" কেহ বলে, "কি আদুরে মেয়ে রে বাবা, কথায় কথায় কান্না!"

এ সব আলোচনায় অনিন্দিতার কান্না আরও বাড়িয়া ওঠে। শেষে এমন হয়, একবেলা বা দুইবেলা সে 'বয়কট্' হইয়া থাকে। দিদির উপর যত অভিমান থাকুক, রাত্রে বিছানায় ঢুকিয়া সে দিদির কাছে এ-সবের নালিশ করে। সুলতা তাহাকে কখনও বুঝাইয়া শান্ত করে, কখনও নিজের অপরাধ স্বীকার করিয়া বলে, "না রে, এবার থেকে তোর কাছছাড়া হবো না আর।"

কিন্তু কাজে তা সম্ভব হয় না। সুলতা বড় হইয়াছে, এখানে আসিয়া তার জন্য যে পণ্ডিত আর মাষ্টার ঠিক হইয়াছে—সুনীতি আর প্রভাময়ী তাঁর পুরাতন ছাত্রী; এরা এখানে সুলতার সমবয়সী আর সঙ্গিনী। বয়সের গুণে তাহাদের সঙ্গে সুলতার বেশ ভাব হইয়াছে। অনিন্দিতা বয়সে ছোট, কাজেই সে ইহাদের দলে ভিড়িতে পারে না। ইহারা অনিন্দিতাকে স্নেহের চোখে, অনুকম্পার চোখে দেখে। সুলতাও সমবয়সী প্রভা আর সুনীতিকে ছাড়িয়া আসিতে পারে না। তাকে কাছে-কাছে রাখিতে চাহিলেও এত-বড় সংসারে এত লোকের ভিড়ে ছোট বোনটিকে লইয়া ঘুরিবার সুবিধাও মেলে না! তাছাড়া সমবয়সীরা ডাকিলে তাহাদের এড়াইয়া অনিন্দিতাকে

লইয়া থাকা ভালো দেখায় না—এমনি নানা কারণে দিদিকে অনিন্দিতা বড় অল্প করিয়াই পায় !

দাছও এখানে আসিয়া ছু-চারজন পৌত্র-পৌত্রী দৌহিত্র-দৌহিত্রীকে পড়াইতে বসেন—সংস্কৃত পড়ান, ব্যাকরণ পড়ান। অনিন্দিতা ছোট—সেখানে সে কি বলিয়াই বা ঘেঁষিবে ? তাছাড়া অশনে বসনে শয়নে পঠনে শাসনে কোনো দিকে কাহারও সঙ্গে পার্থক্য নাই। প্রত্যূষে উঠিয়া প্রত্যেকটি ছেলেমেয়েকে শুচিতা রক্ষা করিয়া পরিচ্ছন্ন বেশ পরিতে হয়, দাছকে প্রণাম করিয়া দেবদেবীর ধ্যান প্রণাম-মন্ত্র এবং বাছা-বাছা নীতি শ্লোক আবৃত্তি করিয়া বাগানে খানিকটা ছোটাছুটি করিতে হয় ; তারপর পড়িতে বসা। মেয়েদের পূজার জন্য ফুল-তোলা—ঠাকুর-পূজার আয়োজন করা—ছেলেদের জল-খাবার আনিয়া দেওয়া—তারপর জল খাইয়া পণ্ডিত-মশায়ের কাছে তাদের পড়িতে বসা। তারপর একটু বেলা হইলে দাছর সঙ্গে বাড়ীর গাড়ীতে চড়িয়া কিছু দূরের বাগানে ঘুরিয়া আসিয়া নদীতে স্নান, সাঁতার শেখা—তারপর একসঙ্গে বসিয়া সকলের আহার। অবশ্য সকল কাজই পালা করিয়া করা হয়। যে মেয়েদের বিবাহের বয়স হইয়াছে, পূজার কাজ আর ছু'বেলার জলখাবার পরিবেষণ করার ভার তাহাদের উপর। বাগানে বেড়াইতে যাওয়ার ব্যাপারেও চার-পাঁচজন করিয়া ছেলেমেয়ের পালা পড়ে। শীতের সময় ছুপুরে বজরায় চড়িয়া বেড়াইতে যাওয়া—তাহাতেও এই এক নিয়ম—পালার ব্যবস্থা।

আহারাদির পর ছেলেরা স্কুলে যায়, মেয়েরা বাড়ীতে মাষ্টারের কাছে পড়িতে বসে। কালিদাস পড়িবার মত যাহাদের বিদ্যা, দাছ তাহাদের লইয়া বসেন। তাহাদের অনুবাদ করিতে হয়—কবিতা লিখিতে হয়। কবিতা লেখায় প্রতিযোগিতা চলে। যাহার কবিতা

ভালো হয়, দাদু তাহাকে পুরস্কার দেন। বৈকালে বাড়ীর বাগানে খেলার ব্যবস্থা। ছেলেমেয়েরা আসিয়া জমে। কম-বয়সের মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিয়া সব রকমের খেলা খেলে—শুধু ফুটবল ছাড়া। এ-বাড়ীতে ফুটবলের চেয়ে অন্য সব খেলার প্রচলনই বেশী। মেয়েদের জন্যও জিম্‌নাষ্টিক করার জায়গা আছে—পর্দ্দা-ঘেরা। রাত্রে আহারাদি সারিয়া বাড়ীর ছোট-বড় সকলে দাদুর ঘরে আসিয়া বসে। ছোটরা নাম্‌তা মুখস্থ বলে—মুখে মুখে অঙ্কের পরীক্ষা দেয়। তারপর বাংলা আর ইংরেজীর আবৃত্তি। সাড়ে আটটায় ছুটী। ও-দিকে আবার ভোর পাঁচটায় বিছানা ছাড়িয়া ওঠা চাই। ভোরে সূর্য্যোদয় দেখা চাই —দাদুর বিশেষ বিধান।

এই বিধি-নিয়ম-নিষেধ ব্যবস্থার মধ্যে কাহারো স্বেচ্ছাচার নাই।

অনিন্দিতা ভাবে, এখানে যেন স্নেহের অভাব! এখানে আসিবার পূর্ব্বে যেভাবে দিন কাটিত—তার মনে হয়, সে-যেন স্বপ্ন! যে-দিদিকে সব সময়ে কাছে পাইত, এখানে সে-দিদিকে চাহিয়াও পাওয়া যায় না! একেই সে অভিমানী, এ-সব ব্যাপারে তার অভিমান এমন বাড়িয়া যায় যে, কথায়-কথায় চোখে জল আসে—সামান্য ছুতায় কাঁদিয়া-কাটিয়া সে রসাতল বাধাইয়া দেয়!

অনিন্দিতার কিছু ভালো লাগে না। নিয়ম মানিয়া পড়িতে বসে—কিন্তু পড়ায় মন নাই! দিদির কথা মনে করিয়া অভিমানে ফুলিতে থাকে। পড়ায় কেবলি ভুল হয়। দাদু আশ্চর্য্য হন, বলেন, "তোমার কি হলো দিদি? পড়াশুনায় মন নেই?"

ইহার বেশী তাঁকে বলিতে হয় না, এইটুকু বলিবামাত্র অনিন্দিতা কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়ে। দাদু আদর করেন—কত বুঝান—কিন্তু অনিন্দিতার চোখের জল কিছুতেই থামিতে চায় না! নিজেকে অত্যন্ত অসহায় ভাবিয়া সকলের উপর তার অভিমান হয়, রাগ হয়!

রাত্রে দিদি যখন বিছানার মধ্যে তাহাকে দু'হাতে জড়াইয়া ধরিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলে, "আজ কি হয়েছিল রে? পড়ায় একটুও মন দিচ্ছিলি না কেন?"

তখন অনিন্দিতার সর্ব্বশরীরে যেন জ্বালা ধরে! দিদি জানে না, তার কি হইয়াছিল? এ-কথা জিজ্ঞাসা করার অর্থ আছে? কেন, কেন দিদি তার দিকে একটু চাহিয়া থাকিতে পারে না! কেন দিদির এখন ওই সুনীতি-দিদি আর প্রতিভা-দিদিই সব—অনিন্দিতা তার কেহ নয়? এতদিন—এতদিন এই অনিন্দিতাই ছিল দিদির একমাত্র সাথী—দিদির সব! এখন নূতন-নূতন কবিতা লিখিয়া উহাদের শুনানো হয়। অনিন্দিতা কোথায় যেন ভাসিয়া গিয়াছে!

প্রাণপণে কান্না চাপিয়া সে গুম হইয়া থাকে। জবাব দিতে পারে না—দিবার ভরসা হয় না। সে জানে, যদি কথা বলিতে যায় —কথা মুখে বাহির হইবে না! সে কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিবে! তাহা হইলেই তার পরাভব! না, সে দিদির কাছে কিছুতেই হার মানিবে না। নিষ্ঠুর দিদি—থাক সে নূতন বন্ধুদের লইয়া মত্ত! দিদির দিন যদি অত হাসি-খুশীতে কাটিতে পারে, অনিন্দিতারই বা কেন কাটিবে না? সেও দিদির বদলে ঐ নন্দিনী, সুদেষ্ণা-দিদি—তাদের সঙ্গে খুব বেশী-বেশী ভাব করিবে! দিদিকে একটুও ভালো না বাসিয়া উহাদেরই ভালোবাসিবে। দিদি তাহা হইলে জব্দ হইবে।

অনিন্দিতা ভাবিল, তার চেয়ে তার খুব অসুখ করুক্। তখন দিদি ঔষধ খাওয়াইতে আসিবে—অনিন্দিতা কিছুতে দিদির হাতে ঔষধ খাইবে না। দিদি তখন কথা কহিতে আসিলে অনিন্দিতা চোখ বুজিয়া থাকিবে। তাহা হইলে দিদি খুব জব্দ হইবে!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পৃথিবীতে মানুষের মনের আন্তরিক কামনা কখনও-কখনও পূর্ণ হয়—তার পরিচয় পাইতে অনিন্দিতার বিলম্ব হইল না।

সরস্বতী-পূজার দুদিন আগে হঠাৎ তার জ্বর হইল। সেজন্য দুঃখের সীমা নাই। সরস্বতী-পূজায় কত কি করিবে বলিয়া সকলে কি আগ্রহে উদ্যোগ-আয়োজন করিতেছে—অনিন্দিতাও ঠিক করিয়া রাখিয়াছে, কি করিবে। এমন সময় হঠাৎ এই জ্বর!

অনিন্দিতাকে শয্যা লইতে হইল। সে শয্যা লইলে সুলতার সব-কিছু ওলোট-পালোট হইয়া গেল। মলিন মুখে সে বসিয়া আছে সকলকে ত্যাগ করিয়া অনিন্দিতার কাছে। তার টেম্পারেচার দেখা, তাকে ঔষধ-পথ্য খাওয়ানো, তাকে স্বচ্ছন্দ রাখা—সব ভার সে নিজে যাচিয়া গ্রহণ করিয়াছে।

সরস্বতী-পূজার দিন বাড়াশুদ্ধ মেয়ে বাসন্তী রঙে ছোপানো শাড়ী পরিয়া কুন্দকলির গাঁথা মালা হাতে কল-হাস্যে বাড়ী মাতাইয়া তুলিয়াছে—অনিন্দিতা জ্বর-গায়ে বিছানায় পড়িয়া আছে। পাশে বসিয়া সুলতা তার মাথায় অডিকোলনের জলে ভিজানো পটি দিয়া তাহাকে বাতাস করিতেছে।

শাড়ীর খসখস শব্দ করিয়া সুনীতি আসিয়া ঘরে ঢুকিল—তার অঙ্গে ফুলের সৌরভ—অলঙ্কারের মৃদু রিণি-ঝিনি। অনিন্দিতা চোখ চাহিয়া দেখিল। সাজ-সজ্জায় দিদির সঙ্গে সুনীতির পার্থক্য দেখিয়া তার মন কেমন ছাঁৎ করিয়া উঠিল! অনিন্দিতাই ঠাকুর-দেবতার কাছে মানত করিয়া যাচিয়া অসুখ আনিয়াছে—দিদিকে জব্দ করিবে বলিয়া! মনে হইল, ছি, সে ভারী স্বার্থপর! নিজের অসুখের জন্য দিদিকে এমন কষ্ট দেওয়া! সে খুব অন্যায় করিয়াছে!

সুনীতি আসিয়া মৃদু কণ্ঠে সুলতাকে বলিল, "নতুন-ঝিকে ডেকে দিচ্ছি, তুই যা—চুল বেঁধে, কাপড় পরে নে! নৌকা করে আজ আমরা বেড়াতে যাবো, দাদু যাবেন না—ছোট পিসিমা সঙ্গে যাবেন। খুব আমোদ হবে।"

অনিন্দিতার মনের মধ্যে যেন একটা মোচড়! দিদিকে জব্দ করিবার জন্য সে যদি ফাঁদ না পাতিত, সেও তাহা হইলে আজ এই বসন্ত পঞ্চমীতে আমলা-মেতি দিয়া মাথা ঘষিয়া সেই ফুলানো-চুলে বাসন্তী রংয়ের ফিতার সঙ্গে হরিদ্রা-বর্ণের সপত্র গোলাপ গুঁজিয়া বাসন্তী শাড়ী পরিয়া সাজিত—তারপর দেবীর প্রসাদী পাঁচভাজা, ক্ষীরখণ্ডি, ডাঁসা কুল খাইয়া নৌকায় করিয়া বেড়াইতে যাইতে পারিত! দুঃখে ক্ষোভে তার দুচোখ জলে ভরিয়া উঠিল। কিন্তু তখনি মৃদু কণ্ঠে সুনীতির কথা কাণে ঢুকিতে সে কাঠ হইয়া শুনিতে লাগিল।

অনিন্দিতা ঘুমাইতেছে ভাবিয়া সুলতা বলিল, "ও এমন বিছানায় পড়ে থাকবে—না ভাই, আমি যাবো না। তোরা যা—এসে বেড়ানোর গল্প বলিস, শুনবো।"

সুনীতি বলিল, "আহা, কি এমন হয়েছে! ডাক্তারবাবু বললেন, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা—তার জন্যে এত কিসের ভাবনা! কেনই বা তুই যাবি না? নে, ওঠ।"

সুলতা অনিন্দিতার কপালে জলপটি দিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল, "থাক্ ভাই! আমার ইচ্ছা করছে না। ও এমন পড়ে থাকলে আমার কিছু ভালো লাগে না। এর পর ও ভালো হলে তখন ওর সঙ্গে ওই সব কাপড়-চোপড় পরবো—আজ আর কিছু করবো না আমি।"

সুনীতি চলিয়া গেল। মুখের নির্ব্বাক ভঙ্গীতে, চলার ধরণে অভিমান ঘোষণা করিয়া গেল—সুলতা তাহা বুঝিল। কিন্তু কি করিবে,

সে নিরুপায়! অনিন্দিতার অসুখ হইলে তার কিছু ভালো লাগে না। সামান্য অসুখ কখন কি করিয়া বাড়িয়া অসামান্য হইয়া ওঠে, সুলতার তাহা জানা আছে। কাঠ হইয়া অনিন্দিতার কাছে বসিয়া তার দিকে অপলক নেত্রে চাহিয়া সুলতা কেবলি ঠাকুর-দেবতাকে ডাকে, "অনিকে ভালো করে দাও ঠাকুর, আমি হরির লুট দেবো।"

সুনীতি চলিয়া গেলে হু'চোখে আগুন ভরিয়া অনিন্দিতা ডাকিল, "দিদি!"

"কেন ভাই?" বলিয়া সুলতা সাড়া দিল।

অনিন্দিতা কোন জবাব দিল না।

সুলতা আবার বলিল, "কেন? কষ্ট হচ্ছে? মাথাব্যথা কমেনি? কি চাস্, বল না? জল খাবি?"

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া অনিন্দিতা বলিল, "নাঃ—"; তারপর খানিক ইতস্ততঃ করিয়া আবার ডাকিল, "দিদি!"

তার তপ্ত দুর্ব্বল একটা হাত নিজের হাতে তুলিয়া ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে বুলাইতে সস্নেহে সুলতা জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় কষ্ট হচ্ছে? বল।"

সঙ্কোচ কাটাইয়া অনিন্দিতা বলিল, "না, কষ্ট হচ্ছে না—কিছু হচ্ছে না—তুমি যাও, চুল বেঁধে কাপড় ছেড়ে ওদের সঙ্গে বেড়াতে যাও।"

সুলতা মৃদু হাসিল—মলিন হাসি! হাসিয়া সুলতা বলিল, "না রে, আমি যাবো না।"

অনিন্দিতা বলিল, "কেন যাবে না?"

সুলতা বুঝিল, অনিন্দিতা তাদের কথা শুনিয়াছে, শুনিয়া দুঃখ হইয়াছে, তাই অভিমানে এ-কথা বলিল।

হাসিয়া সে জবাব দিল, "তুই পড়ে থাকলে কবে আমি সেজেগুজে

বেড়াতে যাই বল তো যে আমায় যেতে বলছিস ?” তারপর আরও স্নিগ্ধ কণ্ঠে সান্ত্বনার সুরে কহিল, “তুই ভালো হয়ে গেলে জানিস অনি, দাদুকে বলে আর একদিন আমরা নৌকায় করে বেড়াতে যাবো। নাই-বা হলো বসন্ত পঞ্চমী—দোল-পূর্ণিমাতে যাবো।”

অনিন্দিতা এমন যুক্তিতে আরাম পায়, কিন্তু আজ এ-কথায় সে সান্ত্বনা পাইল না! অসহিষ্ণু ভাবে মাথা নাড়িয়া সে জিদ ধরিল, “না, তা হবে না দিদি, তুমি যাও।” বলিতে বলিতে অনেক কষ্টে চাপা কান্না হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

দুচোখে যেন বন্যা নামিল।

বিব্রত হইয়া সুলতা রুমাল দিয়া তাহার চোখ মুছাইয়া দিতে দিতে বলিল, “শুধু শুধু হাঙ্গামা করিস কেন বল্‌তো? জানিস, আমি যাবো না, মিথ্যা জেদ ধরে কেঁদে রোগ বাড়ানো! আর ক'দিন পরে ও কাপড় পরলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না!”

অনিন্দিতা পাশ ফিরিয়া মুখ গুঁজিয়া শুইল—কিছুক্ষণ গুম হইয়া রহিল, তারপর অস্ফুটে কহিল, “এ তো আমার আপনা থেকে অসুখ হয়নি—তবে কেন তুমি শুধু শুধু আমার জন্যে—”

কণ্ঠ রুদ্ধ হইল—কান্না ঠেলিয়া রাখা গেল না।

অনেক আদর-যত্ন-উপদেশে শান্ত হইয়া দিদির হাত ধরিয়া অনিন্দিতা বলিল, “জানো দিদি, ঠাকুর-দেবতাদের ডেকে ডেকে আমি অসুখ করেছি। জানি, আমার অসুখ হলে তুমি ওদের কাছে যাবে না—সব সময় আমার কাছে থাকবে, তাই!”

কথাটা বলিয়া লজ্জায় অনিন্দিতা বালিশে মুখ গুঁজিল!

সুলতা কোন কথা বলিল না—নূতন সঙ্গিনীদের পাইয়া সত্যই সে অনিন্দিতার কাছে তেমন ঘেঁষ দেয় না! বেচারী সেজন্য মনে

খুব কষ্ট পায়! ইহা বুঝিয়া নিজেকে সে অপরাধী বলিয়া কুণ্ঠিত হইল। অন্তরের আকুল প্রার্থনা ভগবানের পায়ে নিবেদন করিয়া মনে মনে সুলতা বলিল,—আমার জন্যেই, শুধু আমার জন্যেই ও এই কষ্ট পাচ্ছে ঠাকুর, ওকে তুমি ভালো করে দাও।

তারপর মুখ তুলিয়া অনিন্দিতা দেখিল, দিদির মুখ মলিন—দুচোখ যেন বাষ্পভারে আচ্ছন্ন! দেখিয়া সে আর থাকিতে পারিল না। সুলতার একখানা হাত ধরিল—মিনতি করিয়া বলিল, "তুমি রাগ করো না দিদি! আমি খুব দোষ করেছি। কি করবো, ওরা যে তোমাকে আমার কাছে কিছুতে থাকতে দেয় না, তাই তো—"

বাকিটুকু সে লজ্জায় প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিল না; বলিবার প্রয়োজনও ছিল না।

সুলতা তার মনের কথা জানিয়া ফেলিয়াছে। বোনকে আদর করিয়া, তার গায়ে-মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে গভীর স্নেহে সুলতা বলিল, "তুই পাগলী! কিন্তু না, আর কখনো এরকম মনে করবি না। ভগবান তাহলে রাগ করবেন। তোর কোনো কথা তিনি কখনো আর শুনবেন না! বুঝলি?"

দিদির দুহাত চাপিয়া ধরিয়া অনিন্দিতা বলিল, "না—আর কখনো ঠাকুরের কাছে এমন কথা বলবো না। তুমি রাগ করো না দিদি। এবার থেকে আমি খুব লক্ষ্মী হবো।"

সুলতা সস্নেহে বলিল, "হ্যাঁ—লক্ষ্মী হয়ো।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কিন্তু এত করিয়াও দিদিকে অনিন্দিতা নিজের কাছে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। এ বাড়ীতে এই একটা বছর ধরিয়া কি যে ঘটিতেছে! বছর না ফিরিতেই তিন-তিনটি বিবাহ হইয়া গেল! প্রথম সুনীতির বিবাহ। বর দেখিতে বেশ ভালো—বি-এ পাশ—মিষ্টভাষী অমায়িক! অনিন্দিতা কখনো বিবাহ দেখে নাই। রামায়ণে মহাভারতে পড়িয়াছে রাম-লক্ষ্মণের বিবাহের কথা—দ্রৌপদীর বিবাহের কথা। পশ্চিমে থাকিতে মাঝে মাঝে 'বরিয়াৎ' যাইতে দেখিয়াছে। জানে, বর যায় কন্যার বাড়ীতে, গিয়া কন্যাকে বিবাহ করিয়া নিজের বাড়ীতে আনে।

এখন সুনীতি-দিদির বিবাহ দেখিয়া বিবাহ জিনিষটা ভালো লাগিল, বিবাহের উপর তার শ্রদ্ধা হইল।

বিবাহের পরের দিন সুনীতি-দিদি না কাঁদিয়া বাড়ী ছাড়িয়া বরের সঙ্গে বেশ চলিয়া গেল দেখিয়া অনিন্দিতা ভারী আশ্চর্য্য হইল! বাড়ীর সকলকে ছাড়িয়া অজানা বরের সঙ্গে বেশ চলিয়া গেল তো! তার উপর কদিন ধরিয়া শাড়ী আর গহনা সুনীতি-দিদি পাইয়াছে এই এত! বিবাহে ভারী মজা—কত লাভ! বাঃ!

আসিয়া মাকে সে বলিল, "সুনীতি-দিদি তো কই তেমন কাঁদলো না!"

মা কহিলেন, "কাঁদবে কেন? সকলেই কি কাঁদে? এর পর তোরও যখন বিয়ে হবে, বরের সঙ্গে তুই শ্বশুরবাড়ী যাবি, তুইও তখন কাঁদবি না।"

—"হুঁ!" বলিয়া অনিন্দিতা চলিয়া যাইতেছিল, ফিরিয়া আবার বলিল, "কিন্তু দিদির বিয়ে নাহলে তো আর আমার হচ্ছে না। দিদির বিয়ে দাও মা—তাহলেই আমার বিয়ে হবে।"

"দেখি, না হয় একসঙ্গেই দুজনের দেবো।" বলিয়া মা হাসিলেন।

অনিন্দিতা মার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল, বলিল, "তাহলে কি ভালোই হয়! একজনদের বাড়ীতেই তো হবে? আচ্ছা মা, একজনের সঙ্গে হলেই তো আরও ভালো হয়!"

মা খঞ্চিপোষ বুনিতেছিলেন—মেয়ের আবেগের দমকে আঙুলে ছুঁচ ফুটিয়া রক্ত পড়িল। মা বলিলেন, "তুমি যে মেয়ে মা—তোমার জন্যে কে কোন্ বনে বসে তপস্যা করছে, জানি না! দিদির মত এদিকে সব চাই! দিদির মত ঠাণ্ডা হও দিকিনি যে বুঝি, হ্যাঁ, দিদির বোন বটে!"

মার হাতে রক্ত পড়িতে দেখিয়া অনিন্দিতার মুখ এতটুকু হইয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি কুঁজা হইতে গেলাসে জল গড়াইয়া আনিয়া মার আঙুলটা তার মধ্যে ডুবাইয়া দিতে দিতে করুণ-কণ্ঠে কহিল, "আচ্ছা মা, এবার থেকে আমি তাই হবো—দিদির মত অমনি ঠাণ্ডা।"

কিন্তু বলা আর করা, এক নয়। অনিন্দিতা সুলতা হইতে পারিল না, সে যেমন তেমনিই অনিন্দিতা রহিয়া গেল এবং সুলতা সুলতাই রহিল।

ক'দিন পরে পিসতুতো বোন প্রভার বিবাহ হইল—বিবাহ হইল পিসের দেশের বাড়ীতে। বিবাহের পর বর আর প্রভা এ-বাড়ীতে 'জোড়ে' আসিল। প্রভাদের দেশে ম্যালেরিয়া—দু-পাঁচ দিনের বেশী সেখানে থাকিতে কাহারও ভরসা হইল না।

প্রভার বর দেখিতে সুনীতি-দিদির বরের চেয়ে আরো সুন্দর—

তবে সুনীতি-দিদির বরের মত মিশুক নয়, তেমন অমায়িকও নয়।

এ-সব বিবাহ দেখিয়া অনন্দিতার মনে কি আগ্রহ—ইচ্ছা, তাহারো এবার বিবাহ হোক!

সকলে শুনিয়া তামাসা করে, বলে, "বেশ তো—এবার তোর বিয়ে হোক—সুলতার বিয়ে না হয় পরে হবে!"

অনিন্দিতা রাগ করে, বলে, "আহা, তা বুঝি হয়! বড়র বিয়ে না হলে ছোটর বিয়ে হয় না গো!"

শেষে সুলতারও এই আষাঢ় মাসে বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল। দুটি সদ্য-বিবাহিতা দিদির সদ্য-পাওয়া গহনা আর কাপড়-চোপড়ের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া অনিন্দিতা ভাবিল, দিদিরও এবার অমনি গহনা কাপড় লাভ হইবে।

সেদিন সুশীলার বিবাহে নিমন্ত্রণে যাইবার সময় প্রভা কাণে পরিয়াছিল ঝাড়-ইয়ারিং—সুনীতি পরিয়াছিল জড়োয়া কাণবালা আর সুলতা শুধু মায়ের সেই মুক্তার ঝালর দেওয়া দুল কাণে দিয়াছিল। প্রভা আর সুনীতি পরিয়াছিল বাজু জশম তাবিজ তাগা —সুলতার নীচের হাতে শুধু ক'গাছা চুড়ি—উপর-হাতে কোনো গহনা ছিল না। দিদিকে তাদের পাশে খাটো লাগিয়াছিল! অনিন্দিতা ভাবিল, যাক—বিবাহ হইলে দিদিও কত গহনা পাইবে! তখন আর প্রভা বা সুনীতির পাশে তাহাকে খাট হইতে হইবে না! দিদির শ্বশুরবাড়ী সে নিজের চোখে দেখিয়াছে। চমৎকার বাড়ী। দিদির বরকেও দেখিয়াছে—কাহারো চেয়ে কম সুন্দর নয়—এদের চেয়ে বয়স কম! ষোল-সতেরো বছর বয়স হইবে। দাদুর সঙ্গে অনিন্দিতা সেখানে গিয়াছিল। তাহাকে তারা সরস্বতী বলিয়া আদর করিয়াছিল। তার লজ্জা করিতেছিল। দাদু হয়তো বলিয়াছেন, সব তার খুব শীঘ্র

মুখস্থ হয়, সংস্কৃতের উচ্চারণও নাকি তার পরিষ্কার! তাই ওঁরা হয়তো অত আদর করিলেন! একটি সংস্কৃত শ্লোক শুনাইতে বলিয়াছিলেন—দাহুর কাছে সে কত শ্লোক শিখিয়াছে—তখন সে শুনাইয়া দিয়াছিল।

সুলতার বিবাহ সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গেল। আইবড়-ভাতের তত্ত্ব যা আসিল, তাহাতে এ-বাড়ীর উত্তরধারের অত বড় লম্বা-চওড়া দালান ভর্ত্তি হইয়া গেল। বিবাহের মিছিলে সারা পথ শুধু বাজনদার আর খাশগেলাসেই ভরিয়া গেল। গড়ের বাজনা হইতে দেশী যত রকম বাজনা আছে, কিছু বাকি ছিল না। সজ্জিত চতুর্দ্দোলে রাজার বেশ পরিয়া মাথায় শিরপেঁকেলৃজা কাণে মুক্তার বীরবৌলি—বরকে দেখাইতেছিল যেন মেবারের রাজপুত্র! সেদিন অনিন্দিতার জ্বর—তবু তার আনন্দের সীমা ছিল না। এমন না হইলে তার দিদির মানায়! কখনো না! তার দিদির ঠিক যেমন হওয়া উচিত, তাই হইয়াছে।

কিন্তু বরকনে-বিদায়ের সময় সুলতা যত কাঁদিল, সে নিজে তার বেশী কাঁদিল। সুলতা অবশ্য ক'দিন ধরিয়াই কাঁদিতেছিল। একে বয়সে ছোট, তার উপর মন তার অত্যন্ত কোমল। এই মেয়েকে পরের হাতে সঁপিয়া দিবার সময় দাহুর চোখও সজল হইয়া উঠিয়াছিল। মায়ের চোখ অমঙ্গল-ভয়ে মুছিয়া মুছিয়া রাঙা হইয়া গিয়াছিল।

জরির ঝালরদার মহাপায়ায় রাণীর বেশে সুলতা স্বামীর চতুর্দ্দোলার পিছনে পিছনে শুভযাত্রা করিল। ঘোর রোলে মঙ্গল-শঙ্খ, রশুনচৌকি, সানাই, ব্যাগ্‌পাইপ আর ব্যাণ্ড বাজিয়া উঠিল। অনিন্দিতা যতক্ষণ পারিল, অনিমেষ-চক্ষে দিদির যাত্রা-পথের দিকে চাহিয়া রহিল—তারপর ছুটিয়া আসিয়া ঘরের বিছানায় লুটাইয়া পড়িল। পড়িয়া তার কি কান্না! দিদি আজ হইতে পর হইয়া গেল, একান্ত

পর হইল—এ'কথা কাহাকেও বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন ছিল না। এ-সত্য যেন সে দিবালোকের মতই সুস্পষ্ট দেখিল। বর-কনের হাতে-হাতে সঁপিয়া দিবার সময় দাদু, জ্যাঠাইমা, সকলেই অশ্রু-গদগদ কণ্ঠে বর সুনীলবাবুকে বলিলেন,—

"এতদিন আমাদের ছিল, এখন থেকে তোমার হলো—তুমি ওর সব দোষ-ত্রুটি সামলে নিয়ে ওকে সুখী করো।"

অনিন্দিতার উদ্বেল চিত্ত সহসা যেন তীব্র ঈর্ষায় জ্বলিয়া উঠিল! তার দিদিকে সুখী করিবে, কোথাকার কে সুনীলবাবু? অসম্ভব! তার দিদিকে কিছুতেই সে পরের হইতে দিবে না! আর যার খুশী সে দিক, অনিন্দিতা দিতে পারিবে না।

জীবনে প্রকৃত দুঃখ সে কখনো অনুভব করে নাই! আদরের দুলালী হইয়াই তার এত দিন কাটিয়াছে। আজ যেন তার সব দেনা ভাগ্যদেবতা আদায় করিতে বসিয়াছেন! তার অভিমানের আর অন্ত রহিল না।

একবার মনে হইল, কে যেন আসিয়া তার কাছে বসিয়াছে! হাঁ, আসিয়াছে। কিন্তু চোখ মেলিতে ভরসা হয় না! চোখ চাহিবে—ভাবিতেছে, যদি দিদি আসিয়া থাকে? কিন্তু সত্যই কি তাহা হইবে? না, না, তাহা সম্ভব নয়! দিদি তার চোখের সামনে মহাপায়ায় বসিয়া বরের সঙ্গে বাজনা-বাদ্য করিয়া বরের বাড়ী চলিয়া গিয়াছে! তবে?

ভয়ে ভয়ে সে চোখ মেলিয়া চাহিল। দেখিল, কাছে বসিয়া দাদু!

দাদুকে দেখিবামাত্র তার দুচোখে যেন বান ডাকিল।

তার চোখের জল মুছাইয়া দিতে দিতে স্নিগ্ধস্বরে দাদু কহিলেন, "মন কেমন করছে, না দিদি?"

"হ্যাঁ। বড্ড। দিদি কবে আবার আসবে?"

দাদু বলিলেন, "পরশু একবার আসবে, ভাই।"

অনিন্দিতা দাদুর দিকে চাহিয়া রহিল খানিকক্ষণ, তারপর ডাকিল, "দাদু!"

"কেন দিদি?"

অনিন্দিতা বলিল, "দিদির জন্যে তোমার মনেও খুব দুঃখ হচ্ছে, না দাদু?"

মৃদু হাস্যে দাদু বলিলেন, "দুঃখ নয় ভাই—সে বাড়ীতে নেই, তার অভাব বোধ করছি! তোমার যেমন দিদি, আমারও তেমনি দিদি তো সে!"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সুলতার শ্বশুরবাড়ীতে অনিন্দিতার খুব খাতির হইল, কিন্তু তাহাতে সে খুশী হইতে পারিল না। অনিন্দিতাকে দেখিয়া সে-বাড়ীর একজন বলিয়া বসিলেন, "আমাদের বউমার চেয়ে ওর বোনের মুখ আরো ভাল। নাক-চোখ যেন রাধিকা ঠাক্রুণের মতন!"

অনিন্দিতা চটিয়া গেল। দিদির চুল কেমন কোঁকড়ানো, তার অঙ্গের গড়ন কেমন সুডৌল, সে-সব চোখে ঠেকিল না! তার নাক চোখ! দিদির মুখের কাছে তার মুখ! এ-সব লোকের কি-রকম চোখ! ভালোকে ভালো দেখে না! এমন যা-তা বলে! কিন্তু তার সবচেয়ে মুস্কিল হইল সুনীলকে লইয়া! অনিন্দিতার এক দাদা আছেন—তার চেয়ে মাসখানেকের বড়—এই দাদা ছাড়া তার কোনো কুলে, কোনো দাদা ছিল না। সুনীলকে সকলে যখন বলিল, 'দাদা' বলিস্, তখন তার মন যেমন খুশী হইল, তেমনি বিরূপতায় ভরিয়া উঠিতেও বাধিল না। তার দিদিকে যে-লোক তার কাছ হইতে ছিনাইয়া লইয়া আসিয়াছে—তাহাকে সে বলিবে দাদা? না! কিন্তু এদিকে আবার সুনীল যতক্ষণ সামনে থাকে, তাকে অনিন্দিতার কি ভালোই না লাগে! সুনীল যাহা বলে, মনে হয়, চমৎকার। মনে হয়, এমন করিয়া আর কাহাকেও সে কথা বলিতে শোনে নাই! সুনীলের কাছ হইতে সে সরিতে চায় না! কিন্তু সুনীল সামনে না থাকিলে হিংসায় রাগে অনিন্দিতা যেন জ্বলিতে থাকে!

তার দিদি যে আর সে-দিদি নাই, সুনীলবাবুর হইয়া গিয়াছে—

সুলতার বিবাহের বৎসর অতীত না-হইতেই সে তাহা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তারপর যত দিন যাইতেছে, ততই সে-সংশয় দৃঢ় হইতে চলিয়াছে।

সুনীলবাবুকে কলেজ যাইতে হয় এ-বাড়ী পার হইয়া এ-বাড়ীর সামনে দিয়া। কলেজের পথে দারোয়ানের হাতে একটা করিয়া মোটা খামের চিঠি সে গুঁজিয়া দিয়া যায়। সে-চিঠির গায়ে নাম লেখা থাকে, শ্রীমতী সুলতা দেবী। সে-চিঠি পাইলেই সুলতার মুখ রাঙা হইয়া ওঠে! সে ছুটিয়া পলাইয়া যায়।

অনিন্দিতা প্রথম প্রথম ইহা লইয়া রাগ করিয়াছে, কাঁদিয়াছে—কথা বন্ধ করিয়াছে—তবু কিছুতে কিছু হয় নাই! সুলতা তাহাকে সুনীলের চিঠি কখনো দেখিতে দেয় নাই। এই তার সেই দিদি? এর মধ্যে আরও আশ্চর্য্য এই যে, ওই সব চিঠি সুনীতিদি'রা পড়িতে পায়। চিঠিতে কত গান, পদ্য, গদ্য, কত কি লেখা থাকে—তাহা লইয়া ক'জনে হাসির ফোয়ারা ছুটাইয়া দেয়! অথচ অনিন্দিতা ছাড়া যে-সুলতা আর কাহারো পানে একদিন ফিরিয়া চাহিত না—ও-চিঠি, ও-হাসির সঙ্গে সে-অনিন্দিতার কোনো সম্পর্ক নাই! উহাদের হাসি-গল্পের মধ্যে অনিন্দিতা যদি কখনো গিয়া পড়ে—সুনীতি-দিদিরা তাকে এক-রকম তাড়াইয়া দেয়। দিদি অবশ্য তাহা করে না—তবে দিদি তো তখন অনিন্দিতাকে কাছে ডাকে না—চুপ করিয়া থাকে! কেন সে অমন নির্লিপ্ত থাকে? অনিন্দিতাকে সুনীতি-দিদিরা সরাইয়া দেয়, সেজন্য দিদির মনে এতটুকু ব্যথা লাগে না? নিশ্বাসে অনিন্দিতার বুক ভারী হইয়া ওঠে—অভিমানে বুকের মধ্যে অশ্রুর সাগর জমে। বিবাহ হইলে মানুষ পর হইয়া যায়—এ-কথা সত্য না-হইলে তার দিদি এমন হইবে কেন?

মনে এ-দুঃখ পুষিয়া রাখা যায় না। সে দুমদুম করিয়া দাদুর ঘরে যায়। দাদুর পায়ের কাছে বসিয়া ডাকে, "দাদু!"

দাদু খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন।

"দিদি?" বলিয়া দাদু খবরের কাগজ হইতে চোখ তুলিলেন। এমনভাবে তাঁর কাজে বাধা দেওয়া একটু নূতন যেন!

"আপনি আমার বিয়ে দেবেন না দাদু?" বলিয়াই অনিন্দিতা কাঁদিয়া ফেলিল।

হাতের কাগজ না নামাইয়া চশমা খুলিয়া দাদু প্রশ্ন করিলেন, "হঠাৎ তোমার বিয়ে? কে বলেছে তোমার বিয়ে দিচ্ছি? পাগল!"

অনিন্দিতা ঈষৎ অপ্রতিভ হইল। কে বলিয়াছে? সত্যই তো, কেহ বলে নাই! হঠাৎ তার এ কি খেয়াল! মুখ নীচু করিয়া সে নীরব রহিল। কি বলিবে, খুঁজিয়া পাইল না।

দাদু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেউ বুঝি তোমায় ও-কথা বলে ক্ষেপিয়েছে? তাদের বলো, তোমার বিয়ের ঢের দেরী আছে। আগে সুদেষ্ণার বিয়ে হবে, তার পর তোমার।"

দাদুর কথা শুনিয়া মনের কোথায় কেমন একটু আনন্দ—অনিন্দিতার সঙ্কোচ তাহাতে কাটিয়া গেল। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সে বলিল, "না, তা নয় দাদু—আপনি কক্‌খনো আমার বিয়ে দেবেন না। আপনাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না—বরাবর আমি আপনার কাছে থাকবো! কেন, আপনি তো সেদিন বলছিলেন—সেই যে স্মৃতিভূষণ মশায়রা এসেছিলেন, আপনি বলছিলেন, সেকালে কত মেয়ে মোটে বিয়ে করতেন না—পড়াশুনা নিয়ে থাকতেন—ব্রহ্মচারিণী হতেন। আমি তেমনি ব্রহ্মচারিণী হবো দাদু, তাঁদের মতন।"

দাদু বিস্ময় বোধ করিলেন। এ-মেয়েটিকে তিনি বিশেষভাবে

লক্ষ্য করেন। এ-বাড়ীর অন্য মেয়েদের সঙ্গে ঠিক মিশিয়া যাইতে পারে নাই, তাহাও তিনি জানেন। কেন পারে নাই, তাহাও তাঁহার অবিদিত নয়। তাই সময়-সময় এ-মেয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি ঈষৎ চিন্তিত হন। এমন কি, একদিন তিনি করুণাময়ীকে বলিয়াছিলেন, "আচ্ছা ছোট মা, তোমার অনির যদি বিয়ে না দিই—কি হয়?" অনিন্দিতার প্রতি শ্বশুরের স্নেহাতিশয্য ভাবিয়া করুণাময়ী শুধু একটু হাসিয়াছিলেন। দাদু কিন্তু গম্ভীর হইয়াই বলিয়াছিলেন, "এ আমার মুখের কথা নয়, মা! মনের কথা। আমার ভয় হয়, ওকে ভালো করে কেউ চিনতে পারবে না হয়তো! মণ্ডন মিশ্র উভয়-ভারতীকে চেনেননি। কিন্তু আমার অনেক বয়স হয়ে গেছে—আমি যদি মরে যাই—তখন ওকে দুঃখ পেতে হবে, মা। না হলে ওকে আমি চিরকুমারী রেখে গার্গী তৈরি করতুম। সে-যোগ্যতা ওর আছে!"

এখন এই আট-বছরের বালিকার মুখে তাঁর সেই চিন্তার প্রতিধ্বনি শুনিয়া তিনি আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন; সহসা কোন উত্তর দিতে না পারিয়া একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ধীর কণ্ঠে তিনি কহিলেন, "এর জবাব তুমি পরে পাবে। তোমার বিয়ে যদি না দিলে চলে, দেবো না। তুমি কিন্তু খুব ভালো করে পড়াশুনা করো, তার উপর সব! কাল থেকে তোমায় আমি মুগ্ধবোধ পড়াবো। যাও, খুব ভালো করে পদ্য-ট্রান্‌শ্লেসন করে ফেল। দিদির মতন হয় যেন!"

অনিন্দিতা খুশী হইয়া চলিয়া গেল। কিছুদিন হইতে সে দাদুর কাছে সংস্কৃত পড়িতেছে। সম্প্রতি প্রবেশিকা-সোপানের হরিশ্চন্দ্র-উপাখ্যান গদ্যে লিখিতেছে। বেশীক্ষণ ভাবিতে হয় বলিয়া পদ্য লেখার ধৈর্য্য তাহার নাই। কিন্তু আজ অনেক ভাবিয়া নীল-লাল কালি দিয়া বাহার করিয়া সে পদ্য লিখিল। দিদি কুমারসম্ভব পড়িতেছে। দিদি নানা ছন্দে কবিতা লেখে! অনিন্দিতা কিন্তু

অনেক চেষ্টা করিয়াও পয়ার ছাড়া অন্য কোনো ছন্দে লিখিতে পারে না। একদিন সে লিখিয়াছিল—

"ভাস্বুরক নামে সিংহ ছিল এক বনে,
বধিত অনেক মৃগ ভোজন-কারণে।
অনন্তর একদিন যত বনবাসী,
বরাহ শশক মৃগ কহে সিংহে আসি—
কহ প্রভু, কি কারণে পশু কর ক্ষয় ?
তুমি পশুরাজ—ইহা তব যোগ্য নয়।"

আজ সে লিখিল—

"কাঁদে শৈব্যা শিরে কর হানি,
হরিশ্চন্দ্র নৃপতির রাণী,
পড়িয়া মুনির শাপে, পুত্রে খাইল কাল-সাপে—
কে'বা আছে হেন অভাগিনী ?
কোথা তুমি এস হে মরণ—
কার তরে রাখিব জীবন ?
পর-গৃহবাসে রহি, যার লাগি এত সহি,
কেড়ে নিলে সেই প্রাণ-ধন।
তাই ডাকি, এসো হে মরণ !"

পরদিন সকালবেলা দাদুর দুটি বিশিষ্ট বন্ধু আসিলে দাদুর কাছে অনিন্দিতার ডাক পড়িল। সে আসিল। তাহার লেখা সেই শৈব্যা-বিলাপ কবিতা ইঁহাদের পড়িয়া শুনাইতে বলা হইল। শুনিয়া তাঁহারা বলিলেন—"এইটুকু মেয়ে—বেশ লিখেছে তো ! বাঃ !"

দাদু বলিলেন, "হ্যাঁ—চেষ্টা করলে একদিন লিখতে পারবে, মনে হয়। ওর দিদি বেশ ভালো কবিতা লেখে।"

দিদির কথা উঠিতে অনিন্দিতার মন একটু চঞ্চল হইল। দিদি না থাকিলে, সুখ হয় না।

দিদি এদিকে চারদিন শ্বশুরবাড়ী, পাঁচদিন বাপের বাড়ী—খুব ছুটাছুটি করিতেছে, পড়ারও ব্যাঘাত হইতেছে। ওদিকে সুনীলের পরীক্ষা আছে। দিদির শ্বশুরকে দাদু বলিয়াছেন, এ ক'মাস তাঁরা যেন ভুলিয়া যান, ছেলের বিবাহ হইয়াছে। শুনিয়া সুলতার শাশুড়ী খুব খুশী হইলেন না—তবে সম্মানিত লোক, বয়সে বড়—সম্পর্কে বাধে। আড়ালে 'রাজার মাকে' যা বলা যায়, তিনি তাই বলিলেন। সুলতা দাদুর কাছে থাকিয়া প্রসন্ন চিত্তে নূতন নূতন কবিতা লিখিয়া খাতা ভরাইয়া ফেলিল।

মাস-আষ্টেক সুলতা শ্বশুরবাড়ীর দরজা মাড়াইতে পাইল না। এর মধ্যে তার কুমারসম্ভব পড়া শেষ হইয়া বাল্মীকি রামায়ণের আদি এবং অযোধ্যাকাণ্ডের পদ্য-অনুবাদ শেষ হইয়া গেল। তার সাবিত্রী-উপাখ্যান, ভট্টির তিন সর্গ—অনেক কিছু সে শেষ করিয়া ফেলিল। ইহার সঙ্গে একদিন-অন্তর সুনীলের দীর্ঘ পত্রের যথাসম্ভব দীর্ঘ উত্তর তাহাকে দিতে হইত। নহিলে অভিমানের যে প্রবল বন্যা বহিত, তাহাতে ভাসিয়া থাকিবার মত শক্তি সুলতার ছিল না। ভাবপ্রবণতা এ বয়সের সহজ ধর্ম্ম হইলেও সুনীলের ধর্ম্ম কিছু উগ্র। সুলতার নিকট হইতে এই ক'মাসের নির্ব্বাসনে তাহার দশা হইয়াছিল বিরহী যক্ষের মত। রামগিরির যক্ষের হাতে কাগজ-কালি-কলম ছিল না—ডাক-টিকিটও ছিল না। সুনীল-যক্ষের সে-সবের অভাব নাই। নিত্য সে কালি-কলম লইয়া কাগজে গদ্যে-পদ্যে মনের বেদনা লিখিয়া ডাক-টিকিটকে দূত করিয়া প্রিয়া সুলতাকে ছন্দবাণে প্রায় অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। নিত্য চিঠি আসে—দাদু না জানিতে পারেন—মা জানিয়াছেন—জানিলেও মা কোনো কথা বলেন নাই। এক-একদিন

মা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "সুনীলের এগ্‌জামিনের পড়া কেমন হচ্ছে রে?" সুলতা কি জবাব দিবে? চিঠিতে ও-কথা কখনো লেখা থাকে না! সুলতা বুদ্ধিমতী—মায়ের এ-ইঙ্গিত বুঝিল অর্থাৎ রোজ যে এত চিঠি লেখে, এগ্‌জামিনের পড়া করিতে সে সময় পাইবে কখন? সুলতা বারণ করে, "রোজ-রোজ চিঠি না লিখে দু-একদিন অন্তর লিখো। রোজ চিঠি এলে সকলে কি মনে করবে?" কিন্তু বিরহী সুনীল নিজের মনের জ্বালায় আকুল—পরের মনের ধার সে ধারে না!

ইতিমধ্যে মস্ত সুযোগ ঘটিল। দাদুকে কি এক বিশেষ কাজে দু'দিনের জন্য বাহিরে যাইতে হইল। তখন সুনীতিদি'র কৌশলে কলেজ-ফেরত সুনীলকে এ-বাড়ীতে আনিয়া চক্রবাক-চক্রবাকীর মিলনের সেতুবন্ধ হইয়া গেল। সে-কাজে সুদেষ্ণার সঙ্গে অনিন্দিতার ডাক পড়িল পাহারাদারী করিতে। অনিন্দিতার মনটা ছাঁৎ-ছাঁৎ করিয়াছিল—দাদুকে লুকাইয়া দাদুর নিষেধ-করা কাজে সাহায্য? কিন্তু উপায় ছিল না। ভয় হইয়াছিল—দাদু আসিয়া যদি জিজ্ঞাসা করেন, "এ-দু'দিন কবে কখন কি করিয়াছিলে?" সে তখন সে-কথার কি জবাব দিবে?

সে যাহা করিল, কেমন করিয়া তার খানিকটা বাদ দিয়া বলিবে? তারপর যদি দাদু টের পান? মিথ্যা কথা বলিয়াছে জানিলে তিনি কি-রকম ঘৃণা করিবেন! আর কি কখনও তার কোন কথা তিনি বিশ্বাস করিবেন?

কিন্তু ফল মন্দ হইল না। তিনি বুড়া হইয়া জন্মেন নাই—ব্যাপারটা তিনি বুঝিয়া লইলেন এবং অতঃপর প্রতি-রবিবার সকালে সুনীলকুমারের এ-বাড়ীতে নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা পাকা হইয়া গেল। সকালবেলা দাদুর কাছে বসিয়া অঙ্ক কষা এবং একসঙ্গে আহারাদির

পর সুলতার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের সে অবসর পাইতে লাগিল। অনিন্দিতা এ নূতন ব্যবস্থায় খুব খুশী হইতে পারিল না। সুনীল আসিলে দিদির ত্রিসীমায় সে ঘেঁষিতে পায় না। তখন দিদি হয় একচেটে সম্পত্তি সুনীতি আর প্রভাদি'দের। তারা তার চুল বাঁধে, শাড়ী পছন্দ করে, কাণে মাকড়ি না ইয়ারিং পরিবে—বলিয়া দেয়। সুদেষ্ণা বা সে কাছে আসিলে, তাড়াইয়া দেয়। বলে, "এই বয়সে ডেঁপো হয়ে যাচ্ছেন! তোরা এখানে কি করতে এসেছিস! যা, পালা।"

এর মধ্যে ডেঁপোমির কি আছে, ওরাই জানে। মোদ্দা ও-দিদি দুটি মোটেই সুবিধার লোক নয়! এদের তাড়াইয়া দিয়া দুজনেই সুলতা-সুনীলের ঘরের দোরে কাণ রাখিয়া আড়ি পাতে! সুদেষ্ণা এবং অনিন্দিতা দুজনেই তাহা চোখে দেখিয়াছে!

একদিন সুনীতিরা ছিল না—সুদেষ্ণা বলিল, "চ, আজ আমরা আড়ি পাতবো।"

ব্যাপারটা অনিন্দিতার মাথায় ঢুকিতে না ঢুকিতে সুদেষ্ণা তার হাত ধরিয়া টানিয়া জানলার পাশে লইয়া আসিল।

ভিতরে কবিতা পড়া হইতেছিল। সুনীল খুব ভালো রেসিটেসন করে। বেশ তালে-লয়ে সে পড়িতেছিল—

"তবে হৃদয়ে ভালোবাসা কেন গো দিলে,
রূপ না দিলে যদি বিধি হে!
পূজার তরে হিয়া, উঠে যে ব্যাকুলিয়া,
পূজিব তারে গিয়া কি' দিয়ে?"

শুনিতে শুনিতে অনিন্দিতা চেঁচাইয়া উঠিল, "দোরটা খুলে দিন না সুনীলবাবু! আমি শুনবো। ভারী সুন্দর পদ্য। কে বলুন তো লিখেছে?"

হাসিতে হাসিতে সুনীল দরজার খিল খুলিয়া দিল—বলিল, "এ-পদ্য আমি লিখেছি।"

"সত্যি!" বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় অনিন্দিতার মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সুদেষ্ণা বয়সে বড়—সুনীল দরজা খুলিতেই সে পলাইয়া গিয়াছিল।

অনিন্দিতাকে সুনীল বলিল, "ঘরে এসো।"

অনিন্দিতা ঘরে ঢুকিয়া বলিয়া উঠিল, "বারে, আপনি তো বেশ ভালো পদ্য লিখতে পারেন!"

সুনীল হাসিতে লাগিল, বলিল, "লিখিই তো! তুমি ভাবো, তোমার দিদি ভালো পদ্য লেখে! আমি তোমার দিদির চেয়ে আরো ভালো লিখি, বুঝলে!"

অনিন্দিতা বলিল, "দাদু বলেন, দিদি খুব ভালো পদ্য লেখে। দাদুকে আজ আমি বলবো—সুনীলদা বলেন, সুনীলদা দিদির চেয়েও ভালো পদ্য লেখে। দাদু তো আপনার পদ্য দেখেননি—দাদু দেখতে চাইবেন!"

এ-কথায় সুলতা একেবারে চমকাইয়া উঠিল! বলিল, "না রে, দাদুকে পদ্য লেখার কথা বলিসনি। তোকে ক্ষ্যাপাচ্ছে। এ-পদ্য ওঁর লেখা নয়—রবি ঠাকুরের লেখা? তাঁর 'মানসী' বইয়ে এ-পদ্য আছে।"

"এঁ্যা!" দুচোখে ভর্ৎসনা ভরিয়া অনিন্দিতা বলিল, "মিথ্যা কথা বলছেন সুনীলদা! ছি! আপনি মিথ্যা কথা বলেন!"

সুনীল কি বলিতে যাইতেছিল, বলা হইল না। অনিন্দিতা বলিয়া উঠিল, "যান, আমি মিথ্যুকের সঙ্গে কথা কই না।"

বলিয়াই সে সশব্দে ঘর হইতে চলিয়া গেল। বাহিরে গিয়া দিদির কথা শুনিল, দিদি বলিল, "কেন ছেলেমানুষকে অমন যা-তা বলে ক্ষ্যাপাও বলো তো!"

সুনীল কোন জবাব দিল না—শুধু হাসিতে লাগিল।

নবম পরিচ্ছেদ

বিরহী যক্ষের শাপ মোচন ঘটিয়াছিল। সুনীলেরও ঘটিল। পরীক্ষা শেষ হইয়াছে। দিদি শ্বশুরবাড়ী গিয়াছে। মাঝে মাঝে এ-বাড়ীতে আসে। এখন সুনীল যখন খুশী আসিতে পারে—তার আসার সম্বন্ধে আর কোনো বাধা-নিষেধ নাই। জামাই সাজিয়া শুধু নিমন্ত্রণ পাইলে আসা—সে-কাল কাটিয়া গিয়াছে।

সুনীল আসিয়া ডিটেক্‌টিভের গল্প বলিয়া, ভূতের গল্প বলিয়া ছোটদের মহলে বেশ আসর জমায়। সুদেষ্ণা আর অনিন্দিতা ছোটদের এ-আসরে সুনীলের প্রধান ভক্ত। সুনীলকে এ-আসরে আসিতেই হয়—না আসিয়া বড়দের দলে থাকিলে অনিন্দিতার অনুযোগ-অভিমানের অন্ত থাকে না। যে-সুনীল অনিন্দিতার কাছ হইতে দিদিকে ছিনাইয়া লইয়া গিয়া একেবারে পর করিয়া দিয়াছে, এমনি করিয়া সেই সুনীলকে অনিন্দিতা ক্রমে আপন-জন বলিয়া মানিবার চেষ্টা করে।

সেদিন সবপ্রথম আষাঢ়ের আকাশ মেঘ-মেদুর হইয়া উঠিয়াছে—তখনো বৃষ্টি পড়ে নাই। কিন্তু আসন্ন বর্ষণের গুরুভারে নদীর এ-পারে ও-পারে দিকচক্র অবনত হইয়া পড়িয়াছে! বাতাস বন্ধ—তবু চারিদিকে কেমন বাষ্প-সজল ভাব!

ও-পারের পারঘাটের দুপাশে দুটা কৃষ্ণচূড়ার গাছে ফুলের যে উৎসব চলিতেছিল, তাহা এখনও চুকিয়া শেষ হয় নাই। কিন্তু তার সে-উৎসব-সজ্জা কিছু মলিন। পারঘাটের কাছে রাণীঘাটের শাণ-বাঁধানো ঘাটের ডান দিকে কদমগাছটায় কুঁড়ি ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে। নদীর বুক প্রশান্ত গম্ভীর—তীরে নৌকার জটলা। নদীর বুকে একখানাও নৌকা নাই—বাতাসের গতিক বুঝিয়া তবে পাড়ি

দিবে ভাবিয়া সব নৌকার মাঝিই ছইয়ের গায়ে হেলান দিয়া কেবল আকাশের পানে চাহিয়া দেখিতেছে।

নদীর ধারে উঁচু পাঁচিলে 'রডোডেনড্রন্' লতায় সাদা গোলাপী লাল আর মিশ্রফুলের অসংখ্য স্তবক ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। নদীর উপরেই লম্বা টানা প্রকাণ্ড দালান—তার ধারে ধারে টবে সাজানো বেগুনী-রংয়ের ভুঁই-চাঁপা ফুটিয়াছে। এ-বেলায় শুকাইয়া আসিয়াছে। এ-ফুলগুলি এই প্রথম ফুটিল। সুলতা এদের দেখে নাই! তাছাড়া যে ছোট একরত্তি বাগান অনিন্দিতা নিজের হাতে তৈরী করিয়াছে, রোদে পোড়ার জন্য জ্যাঠাইমা আর মার কাছে কত বকুনিই না খাইয়াছে—সেখানেও আজ তিন রকমের ক্যানা নূতন দেখা দিয়াছে। অথচ সুলতা আজ এ-সবের কিছু দেখিল না!

অনিন্দিতার বুক যেন ওই বর্ষার মেঘের মতই আর্দ্র ভারী হইয়া উঠিয়াছে। লাল, হলদে, সাদার উপর গোলাপী রংয়ের ছিট ক্যানা ক'টি—সে ভাবিতেছিল, গাছ হইতে তুলিয়া নিজের হাতে দিদিকে দিয়া আসে আর সেই সঙ্গে ক'টা ভুঁই-চাঁপা। দিদি ক্যানা অনেক দেখিয়াছে, কিন্তু ভুঁই-চাঁপা কখনো দেখে নাই।

কাল দিদির চিঠি আসিয়াছে। কবিতায় লেখা চিঠি। পড়িয়া পড়িয়া চিঠিখানা অনিন্দিতার মুখস্থ হইয়া গিয়াছে। সে খানিকটা মনে মনে আবৃত্তি করিল—

"দুই দিন হল অনি, তোমাদের সমাচার,
না পেয়ে চিন্তিত আছি—মনে যেন কত ভার!
কি এত কাজের ঘোরে, ভুলিয়া রয়েছ মোরে,
সারাদিন ভাবি—তবু মিলে না কো দিশা তার!"

হঠাৎ পিছনে পায়ের শব্দ। শব্দ চেনা। সাগ্রহে মুখ ফিরাইতেই অনিন্দিতার দুচোখ ঝকমক করিয়া উঠিল। ছুটিয়া আসিয়া সুনীলকে প্রশ্ন করিল, "দিদি এসেছে?"

সুনীল মাথা নাড়িল। অনিন্দিতা বিশ্বাস করিতে পারিল না। বলিল, "না—আসেনি বৈকি! আপনি কথা দিয়েছিলেন, রবিবারে তাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়িয়ে যাবেন। নিশ্চয় এনেছেন—আমি দেখি গিয়ে!"

অনিন্দিতা ছুটিয়া যায়, সুনীল ডাকে, "আহা শোনো, শোনো, সত্যি সে আজ আসেনি।"

থামিয়া অনিন্দিতা শুষ্কস্বরে প্রশ্ন করিল, "কেন?"

সুনীল কহিল, "আজ নবনলিনীর এক বন্ধু এসেছে বাড়ীতে, তাই আসতে পারলো না।"

অনিন্দিতা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কথা দিয়ে গিয়েছিলেন, সে-কথা দিদিকে বলেছিলেন?"

সুনীল কহিল, "নিশ্চয়! তাতে সে বললে, 'অনিকে বলো, আজ আমার চলে গেলে ভালো দেখায় না, তাই গেলুম না। এবার যেদিন গাড়ীর সুবিধা হবে, নিয়ে যেও।' কি করি, বলো, তোমার দিদি যদি নিজে না আসতে চায়, আমি তো আর তাকে বেঁধে আনতে পারিনে!"

অনিন্দিতার দু-চোখ জ্বালা করিয়া উঠিল। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল, "দিদি আর আমায় ভালোবাসে না, ও এখন আপনাদেরই হয়ে গেছে!"

সুনীলের চোখে কৌতুকোচ্ছল স্নিগ্ধ হাস্য, কিন্তু কণ্ঠে তাহার আভাষ মাত্র না দিয়া সে গম্ভীর ভাবে বলিল, "কেন দেবি, মোর পরে এত অবহেলা! তোমার দিদি যদি আমারই হয়ে গিয়ে থাকে, আমি কি তার যোগ্য নই?"

অনিন্দিতা রাগিয়া উঠিল, বলিল, "যান, আপনাকে আর নাটক করতে হবে না! যোগ্য হলেই বুঝি আপনার হয়ে যেতে হবে? এমন কথা কোন্ শাস্ত্রে লেখা আছে?"

সুনীল সবিনয়ে বলিল, "অয়ি মূঢ়ে, কোন্ শাস্ত্রের নাম করে কাকে লজ্ঘন করবো? এ যে সর্ব্ব-শাস্ত্রের চির-বিধান! ঋক্‌বেদ থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত এ ছাড়া দ্বিতীয় কথা বলেননি! তোমরা বসিয়া আছ বনপ্রান্ত-ভাগে, বাহিরের বিশ্ব তো শুধু গর্জ্জায় না—বর্ষায়ও—সে-খবর রাখো? তোমার দিদি যে আজ অপরাধিনী হয়েছেন, অয়ি মুগ্ধে, একদিন এই মহা-অপরাধিনী শ্রীমতী অনিন্দিতা দেবীকেও ঠিক এই-রকম অপকীর্ত্তির মধ্যে নিমজ্জিত হতে হবে! 'অমোঘ তাঁহার দণ্ড, কঠিন বিধান।' উপায় নেই!"

অনিন্দিতা সবিস্ময়ে সুনীলের দিকে চাহিয়া কহিল, "কি যে আপনি হেঁয়ালি বলেন, সুনীলবাবু! একটুও যদি বুঝতে পারি!"

সুনীল একটা ভুঁই-চাঁপার ফুল ছিঁড়িয়া নিবিষ্ট-মনে তার পাপড়িতে রংয়ের বাহার দেখিতে দেখিতে মুখ না তুলিয়াই বলিল, "হেঁয়ালি কোন্‌খানটা যে তোমার বোধগম্য হল না?"

অনিন্দিতা কহিল, "ওই যে যা-তা বললেন! অনিন্দিতা দেবীর কি সব অপকীর্ত্তি, না, কি বললেন!"

হতাশার ভঙ্গীতে সুনীল কহিল, "হা বিধাতা! 'অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্ শিরসি সে—মা লিখ, মা লিখ!' ওগো নাবালিকে, বলছিলুম, বিয়ে হলে তুমিও ঠিক তোমার দিদির মতই পাপ করবে!"

"আমি?" বলিয়া অনিন্দিতা যেন চমকাইয়া উঠিল, "আমি বিয়েই করবো না!"

সুনীল হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তার হাসির শব্দে সুদেষ্ণা আসিয়া উপস্থিত হইল। সুদেষ্ণা বলিল, "বারে মজা! সুনীলবাবু এসে চুপি চুপি অনিকে নিশ্চয় গল্প বলছেন! এই নন্দিনী, শীগ্‌গির খুকুকে ওর ঝিয়ের কাছে দিয়ে আয়—আমি চললুম।"

সুনীলের হাসিতে এদিকে অনিন্দিতা বিদ্রূপের জ্বালা অনুভব করিয়া চটিয়া আগুন! ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে বলিল, "ভারি যে হাসছেন! জানেন ত কচু! যান, দাদুকে জিজ্ঞেস করে আসুন, দাদু বলেছেন, আমি ব্রহ্মচারিণী হবো!"

এই সময় সুদেষ্ণা আসিয়া আসরে দাঁড়াইল। সে বলিল, "ব্রহ্মচারিণী হবি, না বেহ্মদত্যি হবি! তার চেয়ে বরং মিশনারী বিবি অর্থাৎ 'গুরু-মা' হোস!"

অনিন্দিতা বাঁকা ভুরু সোজা টানিয়া সবেগে বলিয়া উঠিল, "দাদু বলেননি?"

সুদেষ্ণা তাচ্ছিল্যভরে বলিল, "সে কোন্ মান্ধাতার যুগে এমনি কথার কথা বুঝি একদিন বলেছিলেন—সেই কথা হয়ে গেছে ওঁর পাকা দলিল! জানেন সুনীলবাবু, ওকে যদি বলি, শ্বশুরবাড়ী গেলে বকুনি খাবি—ও নাক নেড়ে বলবে, সে-ভাবনা তুমি ভাবো গে, আমি তো আর শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছিনে!"

সুনীল কহিল, "মাভৈঃ, 'গরব সব হায়, কখন টুটে যায়, সলিল বহে যায় নয়নে!' ওর জন্যে তুমি চিন্তিত হয়ো না সুদেষ্ণা দেবি! সেই শুভলগ্নে আমিই হয়তো রবীন্দ্রনাথের মায়ার খেলা গীতি-নাটিকার মায়াকুমারীদের মতো গেয়ে উঠবো, 'প্রেমপাশে বাঁধা পড়েছে দুজনে, দেখ দেখ সখি, চাহিয়া'!"

সুদেষ্ণা খিল খিল করিয়া হাসিতে লাগিল। অনিন্দিতা সক্রোধে

বলিল, "যান, আপনি ভারী অসভ্য হয়েছেন! কথায় কথায় অমন পদ্য আওড়ানো আমি দু-চক্ষে দেখতে পারি না!"

সুনীল আসিয়া অনিন্দিতার পথ আটকাইয়া দাঁড়াইল, হাসিয়া বলিল, "আহা, শোনো—নিতান্তই যাবে যদি, মার্জ্জনা করিয়া যাও মোরে!"—বলিয়া সুনীল হাত-দুটো যোড় করিল।

সুদেষ্ণা অনিন্দিতার চেয়ে দু-বছরের বড়। তার উপর রবীন্দ্রনাথের সদ্য-প্রকাশিত ক'খানা বই সে তাদের লাইব্রেরী-ঘরের আলমারি হইতে চুরি করিয়া আনিয়া পড়িয়াছে। সুনীলের এ-কবিতার ছত্র সে পড়িয়াছে "রাজা ও রাণী" নাটকে। নিজের সে-বিদ্যা জাহির করিবার লোভে স্মিতমুখে সে বলিয়া উঠিল, "বলুন, বলুন, 'অমোঘ তোমার দণ্ড, কঠিন বিধান!'" বলিয়া আবার খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

অনিন্দিতা দু'দিকের আক্রমণে কেমন হকচকিয়া গেল! তার চোখের জল আর বাধা মানিল না! তবু কোনোমতে প্রাণপণে সে-অশ্রু দমন করিতে করিতে অবরুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে সে বলিল, "সুদিদি, তুমি শুদ্ধু লাগতে এলে! বেশ, যত পারো লাগো, আমিও তোমায় দেখে নেবো! আর সুনীলবাবু—'আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু' ভাববেন না! দেখবেন, আমি কখনো দিদির মতো বদলাবো না—বিয়েও করবো না! ঠিক এই রকম থাকবো!" বলিয়া সে আর দাঁড়াইল না—তখনি চলিয়া গেল।

হন্তদন্ত হইয়া নন্দিনী ওদিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া কহিল, "অনিদি! অনিদি! শীগ্‌গির এসো—বড় মামীর কাছে বকুনি খেতে হবে। সুনীলবাবুকে জলখাবার খেতে না দিয়ে এতক্ষণ ধরে খালি বাজে গল্প করছো! তিনি খুব চটেছেন!"

নন্দিনীর উপর হয়তো অন্য আদেশ দেওয়া ছিল, ভগ্নদূতের এ-

কর্ত্তব্যটুকু শেষ করিয়াই সে লাফাইতে লাফাইতে প্রস্থান করিল। তিনজনের মধ্যে সে সকলের ছোট—এ-ক্ষেত্রে সে-ই একমাত্র নিরপরাধ।

ইতিমধ্যে আকাশের স্থির মেঘ খণ্ডিত হইয়া বিদ্যুতের চমক—সঙ্গে সঙ্গে বজ্র-গর্জ্জন—বাড়ীর বড় বড় দরজার সার্শির কাঁচগুলো ঝনঝন করিয়া উঠিল! ঘরের মধ্যে টাঙানো বেলোয়ারি-ঝাড়গুলোর দোলনগুলিতে এবং লক্ষ্ণৌ-ছিটের তূলা-ভরা ঘেরাটোপ-দেওয়া সেতার আর তানপুরার বাঁধা তারে টুং-টাং আওয়াজ ফুটিল! একটা এস-রাজের তার বেশ একটু চড়া-সুরে বাঁধা ছিল, মেঘ-গর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে সে-তারটা অর্দ্ধস্ফুট আর্ত্ত রব তুলিয়া ছিঁড়িয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে মুষলধারে বৃষ্টি নামিল—নদীর জলে ঢেউয়ের মাতন উঠিল!

দশম পরিচ্ছেদ

সুলতার সম্বন্ধে অনিন্দিতা অনেকখানি অবিচার করিয়াছে। দিদির উপর তার প্রচণ্ড দাবী এবং ঠিক ততখানি অভিমান লইয়া সুবিচার করা তার মত মেয়ের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে না। দিদিকে তার জীবনের এই নূতন অধ্যায়ের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া লইতে হইবে তো! প্রথম প্রথম শ্বশুরবাড়ী যাইবার সময় সুলতার মন বেদনায় ভারী হইয়া উঠিত—মুখে হাসি থাকিত না! মা অনেক বুঝাইতেন, "ঐ ঘর তোমার আপন-ঘর মা—ও-ঘরের সঙ্গে তোমাকে সব-বিষয়ে মানাইয়া লইতে হইবে—নহিলে জীবনটা মিথ্যা হইয়া যাইবে। দুঃখ সার হইবে।" সুলতা তবু মনকে সুস্থ সহজ করিতে পারিত না—সে-মন লইয়া অনিন্দিতার দিকেও চাহিতে পারিত না! তাহাতে অনিন্দিতার অভিমান বাড়িত—কত-কি কল্পনা করিয়া দিদিকে ভুল বুঝিয়া সে ভাবিত, দিদি আর সে দিদি নাই! দাদুর কাছে এ-কথা বলিয়া অনিন্দিতা কত নালিশ জানাইত। দাদু তাহাকে শুধু বলিতেন, "তা নয়, দিদির মন কেমন করে কি-না···আমাদের সকলকে ছেড়ে নতুন জায়গায় যাচ্ছে—তাই অমন চুপচাপ থাকে।"

সুলতার শ্বশুরবাড়ীতে গিয়া দাদু সুলতার শাশুড়ীকেও বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, সুলতার মনটা বড় নরম—সেটা অবশ্য তাঁর পক্ষে ভালো! আজ সে তার ছোট ভাই-বোন মা-বাপের জন্য আকুল হইয়া কাঁদে—কিন্তু একদিন এখান হইতে যাইতেও এখানকার জন্যও এমনি করিয়া কাঁদিবে! যে কাঁদিতে জানে, তার প্রাণ সবার জন্যই কাঁদে—পিতৃ-কুল হইতে যে-মেয়ে মন ভার না করিয়া বিদায় লইতে পারে, শ্বশুরকুলেও তার মন থিতাইতে পারে না!

এমনি নানা ব্যাপারের মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে কালে সুলতার মন এই নূতন সংসারে মিশিয়া এক হইতেছিল। এমনিতেই সে সকলকে ভালোবাসে, স্নেহের চোখে দেখে। তাই ছোট ছোট দেবর আর ননদদের—ছোট ভাই-বোনের মত করিয়া লইতে তাহার বাধে নাই। দাদুর উপদেশ, —যেমন তোমার নিজের মার পেটের ভাই-বোনদের তুমি ভালোবাসো, সুনীলের ভাই-বোনদেরও সেই রকম বাসিবে। তুমি যেমন চাও, তেমনই সেও তো তাহা চাইবে! তার মা-বাপ, তার আত্মীয় এখন তোমার হইয়া গেছে, তেমনি ভাবেই তাহাদিগকে মানিতে হইবে।

এ-বাড়ীতে ঝিয়েরাই এতদিন সুপারি কাটিয়া দিত, তার বড় ননদ অতসী পাণ সাজিত, এখন সে নতুন বৌ—সে সাজে। পাণের খরচ খুব বেশী—আশ্রিত এবং আত্মীয়ের সংখ্যা অল্প নয়; কর্ম্মচারী, অতিথি, বন্ধু—কত লোকের যাওয়া-আসা। এই পাণ-সাজা কাজ লইয়া তার অনেকখানি সময় কাটিয়া যায়। কোনোদিন দৈবাৎ পাণে চূণ বেশী হইয়া গেলে সাজা-পাণ খুলিয়া চূণ মুছিয়া আবার নূতন করিয়া মুড়িতে হয়। কিন্তু সে-বা কতটুকু! আর তাও রোজ হয় না; দৈবাৎ একদিন! না হয় তার উপর সুপারি কাটার কাজ আছে। এমনি ছোটখাট কাজ লইয়া সুলতা নিজের মনকে এখানে বসাইতে পারিয়াছে।

তাদের বাড়ীর চেয়ে এ-বাড়ীতে মেয়েদের স্বাধীনতা কম। ওখানে যেভাবে এ-বয়স পর্য্যন্ত চলিয়াছে, এখানে তেমন ভাবে চলিতে গেলে লোকে নিন্দা করিবে, বেহায়া বলিবে। জ্যাঠাইমা বলিয়া দিয়াছেন, গলার স্বর যেন সেখানে উঁচু পর্দ্দায় না ওঠে, দিনের বেলায় সুনীলের সঙ্গে বেশীক্ষণ দেখা-সাক্ষাৎ করিবে না, বাড়ীর সকলকে যত্ন করিবে, শাশুড়ীর কাছে কাছে থাকিবে, তবে শাশুড়ী

ভালোবাসিবেন। তিনি তোমাকে জানেন না, তাঁর কাছে তুমি নতুন মানুষ—তোমাকে ভালো করিয়া জানিলে, তবেই তাঁর ভালোবাসা চিরদিন অটুট থাকিবে!

জ্যাঠাইমার এ-সব কথা সুলতা মানিয়া চলে।

কিন্তু সুনীল তা চায় না। মায়ের উপর, ভাই-বোনদের উপর তার টান আছে—সুলতা তাহাদের সঙ্গে চমৎকার মানাইয়া চলে, এজন্য সুনীল খুব খুশী। কিন্তু এইটুকুই তো সব নয়! সুনীল চায়, সুলতা তাহাকে যেন সরাইয়া না রাখে!

সুনীলের কলেজ আছে—সুলতাকে অবশ্য সে বলে না, তুমি আমার সঙ্গে কলেজে চলো। সুনীল যখন কলেজে থাকে, সুলতা যত খুশী এ-সব কর্ত্তব্য পালন করুক! কিন্তু কলেজ হইতে সুনীল ফিরিলেই সুলতা ভূত দেখিয়াছে, এমনি ভাবে দ্রুত পায়ে সে-ঘর ছাড়িয়া সরিয়া যাইবে কেন?

এখানে আসিয়া প্রথম প্রথম সুলতা এমন করিত না; কিছু বুঝিতে চাহিলে সুনীল তখনই সব কাজ ফেলিয়া তাহাকে বুঝাইতে বসিত।

গত বৎসরও সুলতা যখন এখানে ছিল, সুনীল তাহাকে রবীন্দ্রনাথের মানসী হইতে বাছিয়া বাছিয়া ভালো ভালো কবিতা, ডি. এল. রায়ের হাসির কবিতা, মেঘদূত আর ভট্টির বাছা বাছা অংশ হইতে কত কবিতাই না রবিবারে এবং ছুটির দিনে পড়িয়া আবৃত্তি করিয়া শুনাইয়াছে। সুলতা তার আবৃত্তির সুখ্যাতি করিয়া বলিয়াছিল, "দাদুর কাছে আমাদের আবৃত্তির যে প্রতিযোগিতা হয়, তুমি যদি দাঁড়াও, নিঃযশ ফার্ষ্ট প্রাইজ পাবে।"

অথচ এখন এমন হইল কেন? একদিন রাগ করিয়া সুনীল জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, একটা কথা বলতে পারো?"

সুলতা শান্ত সহজ দৃষ্টিতে সুনীলের পানে চাহিয়া বলিল "কি ?"

"জিজ্ঞাসা করছিলুম, মানুষের বয়স দিন দিন বাড়ে ? না কমে ?"

সুলতার মনে সংশয় নাই। এ-প্রশ্নের গূঢ় অর্থ না বুঝিয়া মৃদু হাসিয়া সে বলিল, "হয়তো কোন্ দিন জিজ্ঞেস করবে, পৃথিবী তার সৃষ্টির দিন থেকে এগিয়ে চলেছে ? না, পিছিয়ে চলেছে ?"

সুনীল মুখ ভার করিয়া বলিল, "হয়তো কোনোদিন তাও বিশ্বাস করতে হবে ! যে স্কেলে তুমি পিছু হঠছো—তাতে এ-কথা জিজ্ঞাসা করা আশ্চর্য্য হবে না !"

সুলতা এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝিল, ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া ঈষৎ হাস্যে উত্তর দিল, "মানুষের বয়স কমে না—বাড়ে বলেই তো মানুষের যত বিপদ ঘটে ! ছোট থাকতে যা করা যায়, বড় হলে কি আর সে সব বজায় রাখা চলে ?"

সুনীল জবাব দিল, "অবশ্য হামাগুড়ি দেওয়া ছাড়া ! যা অসঙ্গত বা অন্যায় নয়, বয়স বাড়ার সঙ্গে সে-সব ছেড়ে আবার সেই চাণক্য-চন্দ্রগুপ্তের যুগে ফিরে যাবার কোনো কারণ আছে ?"

সুলতা দেখিল, কথা কাটাকাটি করিলে শুধু কথা বাড়িবে, মীমাংসার আশা থাকিবে না। মুখ নীচু করিয়া আঁচলের এক-জায়গায় একটু বাড়তি সুতা ঝুলিয়া আছে, সেইটুকুকে টানিয়া সে ছিঁড়িল এবং খেলাচ্ছলে সেটুকু দু-আঙুলে ধরিয়া পাকাইতে লাগিল।

সুনীল তার দিকে একবার অপাঙ্গে চাহিয়া দেখিল, সুলতার কথা বন্ধ করা কঠিন নয়। বাহিরে তাহাকে এত ধীর আর শান্ত দেখায়, মনে হয়, যেন মাটিতে-গড়া মানুষ ! কিন্তু সুলতার ভিতরের যে পরিচয় সুনীল এই ক'টি বছরে পাইয়াছে, তাহাতে বুঝিয়াছে, সুলতার ভিতরটা মাটির নয়, ভিতরে সোনা-মণি-রত্ন ! যেমন সুন্দর তার

মন—তেমনি ও-মনে তেজ আছে—দৃঢ়তা আছে—নিজস্ব বলিয়া সুলতার মতামত আছে। যে-কথাই সুলতাকে বলো, সে ধীরভাবে শুনিবে—চোখা-চোখা যুক্তি-বাণ ছাড়িলেও সুলতাকে সে-বাণ বিঁধে না! মৌন থাকে সে। লেকচার দিয়া সুনীল শেষে বোঝে, সব মিথ্যা হইল! সুলতার মত বদলায় নাই!

সুনীলও জেদী কম নয়! এ-সব যুক্তিকে মানিয়া লইবে না! তাই দু'জনের মধ্যে খুঁটিনাটি লাগিয়াই রহিল। সুনীল বলে, "ছুটির দিন দুপুরটা তোমায় আমার কাছে থাকতেই হবে। তাতে যদি তোমার কলঙ্ক হয়, না হয় হলো! যেহেতু তুমি পরকীয়া নও, কাজেই সেজন্য আমার লজ্জার কোনো কারণ নেই।"

সুলতা বলে, "বারে, লোকে তাতে বেহায়া বলে নিন্দা করবে না? লোকে যাতে নিন্দা করবে—তা আমি করতে পারবো না। লক্ষ্মীটি, আমাকে তুমি মাপ করো—তেমন কাজ আমাকে করতে বলো না!"

সুনীল অভিমান করিয়া বলে, "আমি স্বামী, আমাকে সুখী করবার জন্য একটু পারো না? এত কাব্য-শাস্ত্র পড়ে-শুনে এই বুঝি তোমার শিক্ষা হয়েছে?"

সুলতা প্রশ্ন করে, "কোন্ শাস্ত্রে গুরুজনদের বিধি অমান্য করতে লিখেছে?"

সুনীল চটিয়া যায়, বলে, "রাম যখন বনে যান, সীতা তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন, সংসার নিয়ে পড়ে থাকেননি। কারো মানা না শুনে তিনি স্বামীর সঙ্গে গিয়েছিলেন—গুরুজনদের কথা তিনি তখন ভেবেছিলেন? না, তাঁদের কথা মেনেছিলেন?"

হাসিয়া সুলতা বলে, "না, মানেননি! তুমিও চৌদ্দ বৎসরের জন্য বনে চলো, আমি তোমার সঙ্গে যাবো—সেখানে কোন বিধিনিষেধ মানবার থাকবে না।"

সুনীল হতাশ হইয়া নিশ্বাস ফেলে, বলে, "তাই যেতে হবে দেখছি! তুমি তো আমার মন বুঝবে না! একদিন বেরিয়েই পড়বো এবার।"

সুলতা টেবিলের উপর হইতে মশলার কৌটাটা টানিয়া তাহার মধ্য হইতে বড়-এলাচের দানা মিশানো ভাজা মৌরি-ধনে তুলিয়া সুনীলের হাতে দিতে গিয়া বলিল, "বকে বকে গলা শুকিয়ে গেছে, নাও, খাও।"

রাগ করিয়া সুনীল তার প্রসারিত হাত ঠেলিয়া সরাইয়া দিল, গম্ভীর মুখে বলিল, "গোড়া কেটে আর আগায় জল দিতে হবে না! তুমি আমায় যা ভালোবাসো, তা আমি খুব জেনেছি। আমি বাড়ী থেকে বিদায় না হলে তোমার স্বস্তি নেই! তাই হবে, আমি কলকাতায় হিন্দু হোষ্টেলে থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হবো—তুমি যেমন খুশী পাঁচজনকে মাথায় নিয়ে নৃত্য করো!"

এতটা সুলতার সাহল না, সে নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল। রাগ করিয়া ঘর ছাড়িয়া সুনাল বাহিরে যাইতেছিল, হঠাৎ তার চোখে পড়িল, সুলতার পায়ের কাছে ঘরের মেঝের উপর ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িয়াছে। রাগ-করা বন্ধ হইল—চলিয়া-যাওয়া বন্ধ রহিল, ফিরিয়া অশ্রুপ্লাবিতা অভিমানিনীকে দু-হাতে কাছে টানিয়া আবেগে ব্যঙ্গোক্তি কারয়া কবিতা আওড়াইয়া বসিল, "অয়ি হৃদিলগ্নলতা, তোল মুখ…"

এ-কথায় সুলতা যেন গলিয়া গেল! সে হাসিয়া সুনীলের বুকে মুখ গুঁজিল। কিন্তু একটা ঠোকর দিবার লোভও সামলাইতে পারিল না। সুলতা বলিল, "রবি ঠাকুর ভারী বিপদ ঘটিয়েছেন, দেখছি! যার যত মনের কথা চুরি করে করে লেখার মধ্যে জমিয়ে রেখেছেন! বিনা-মেহনতে কবিত্ব ছড়ালেই হলো!"

হাসিয়া সুনীল কহিল, "তোমার মত মৌলিক রচনা তো সকলে করতে পারবে না, ভাগ্যে উনি লিখে রেখেছেন, তাই! নাহলে আমাদের মত অকবিদের দশা কি হতো? কিন্তু এ-অভাগার উদ্দেশে তুমি কখনও দু-ছত্তর কবিতা কোনো দিন লিখেছো?"

সুলতা মুখ তুলিয়া চোখের জল মুছিতেছিল, সেই ভিজা চোখে রামধনুর মতো হাসির ছটা বিচ্ছুরিত করিয়া সুলতা বলিল, "তুমি ভারী অকৃতজ্ঞ! তোমার উদ্দেশে কবিতা আমি লিখিনি? বলো, লিখিনি বলো?"

সুনীল তাহাকে টানিয়া আনিয়া তার ঢেউখেলানো খোলা ভিজা চুলে একটা টান মারিয়া কৃত্রিম খেদে বলিল, "তাই বটে! সে বুঝি আমার জন্য লিখেছিলে? সে তো তোমার কল্পনা-রাজ্যের অধীশ্বর মানসমোহনের উদ্দেশে! নাহলে ঐ যে লিখেছো—'ছিলে তুমি মানস-কাননে—মূর্ত্ত হয়ে এলে'—এ কথা কেন লিখলে? আমি কবে তোমার মানস-কাননে মালীগিরি করেছি, বলো? কোনোদিন বলেছি তোমায়, আমি তব মালঞ্চের হবো মালাকর!"

সুলতা রাগিয়া সুনীলের হাত হইতে গোছা-করা চুলগুলো ছিনাইয়া লইয়া কহিল, "যাও, তোমার সঙ্গে কথা কইতে ইচ্ছা করে না, এমন সব বিশ্রী কথা তুমি বলো! কল্পনা-কাননে মালীর দরকার হয় না গো—সেখানকার ফুল আপনি ফোটে। তোমার সম্বন্ধে যদি কবিতা লিখি, তাহলে কি-রকম করে লিখতে হবে, তুমি একটা খসড়া করে দিও, দেখে লিখে দেবো,—রোজ রোজ আর খোঁটা খেতে পারিনে।"

সুনীল মুখ টিপিয়া হাসিল, কিন্তু তখনি গম্ভীর হইয়া বলিল,

"সেই ভালো, এবার তার একটা ব্যবস্থা করে ফেলতে হবে, দেখছি ; নাহলে সন্দেহ হয়, ওই যে লিখেছো—

> "স্বপ্নের জগতে যেন হয়েছিল দেখা, কবে—নাহি জানি।
> বিস্মৃতির তল হতে এতটুকু রেখা কে তুলিল টানি!"

এ-সব আমার মতো মন্দমতি অভাজনের জন্য নয় নিশ্চয়! আমি নাকি আবার তোমার কৌমার-জীবনে স্বপ্নলোকে অনিরুদ্ধের মত—"

"আঃ, যাও!" বলিয়া উঠিয়া সুলতা বাহির হইয়া গেল। সুনীল শূন্য ঘরে উচ্ছ্বসিত হাস্যে সোফার উপর লুটাইয়া পড়িল। কেন যে সুলতার সঙ্গে খুনসুটী করিতে এত ভালো লাগে, সে জানে না! অনেক সময় সুলতার সংসার-জ্ঞানের স্বল্পতা এবং বিদ্যাবত্তার তীক্ষ্ণতায় তুচ্ছ বস্তু লইয়া তাহাকে আঘাত দেওয়া হয়! সুনীল লজ্জা পায়, ব্যথা পায়, ঘাট মানে, মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করে ; কিন্তু সে-প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারে না। সুলতার অতি-কোমল মন পাইয়া ছেলেমানুষী-খেলার লোভ সুনীল সম্বরণ করিতে পারে না।

একাদশ পরিচ্ছেদ

সুদেষ্ণার বিবাহের কথাবার্ত্তা চলিতেছে। দু-এক জায়গা হইতে মেয়ে দেখিতেও আসিয়াছিল। এক-পক্ষ মেয়ে দেখিয়া বলিল, মেয়েটি বড় ছোট, ছেলের সঙ্গে মানাইবে না। আর এক-পক্ষে ছেলে ছোট, সেখানেও ঐ আপত্তি, 'মানাইবে না'। দাদু বিরক্ত হইয়া মাস-কয়েক মেয়ে দেখানো বন্ধ দিলেন। ঘটক ক্ষুণ্ন হইয়া ফিরিয়া গেল—কিন্তু হাল ছাড়িল না। বরং আরো উৎসাহিত হইয়া ছাত্রদের মেসে এবং বিশেষ করিয়া হিন্দু হোষ্টেলে আনা-গোনা করিতে লাগিল। শেষে বিবাহযোগ্য কুমারবৃন্দের এক প্রকাণ্ড ফর্দ্দ লইয়া কনের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত। উভয়পক্ষে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে নদীর জলে ভাসিয়া এক বিসর্জ্জনের কাত্তিক-ঠাকুরের কাঠামো বাড়ীর ঘাটের পাশে একঝাড় বগটী-ফুলের গাছে আটকাইয়া গিয়াছিল। সুদেষ্ণা আর অনিন্দিতা নদীতে স্নান করিতে গিয়া সেই লোভনীয় বস্তু আবিষ্কার করে এবং সযত্নে তাহাকে তুলিয়া আনিয়া বাগানের এক নিভৃত অংশে মাটি দিয়া খানিকটা জায়গা লেপামোছা করিয়া বেদী রচনা করিয়া কাঠামোটিকে প্রতিষ্ঠিত করে। কার্ত্তিক-ঠাকুরের আর-সবই প্রায় বজায় আছে, শুধু মুণ্ড নেই।

কার্ত্তিক-ঠাকুরের এমন দুর্দ্দশাকে দৈব-দুর্ব্বিপাক বলিয়া অনিন্দিতা ও সুদেষ্ণা স্বীকার করিতে রাজী হইল না। গণেশের মত গজমুণ্ড বা অশ্বমুণ্ড সংগ্রহ না করিয়া, গঙ্গাতীরের মাটি আনিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া তাহা দিয়া তাঁহার অর্দ্ধগলিত পলিত

দেহকে নূতন করিয়া গড়িল—খড়ের উপর মাটির মুণ্ড বসাইয়া গড়িতে লাগিল। এ-কাজ সহজ নয়, তবু পঁচিশবার কার্ত্তিকের মুণ্ড গড়া হইল, পঁচিশবার ভাঙ্গা হইল। অনিন্দিতার ধৈর্য্য কম, কারু-শিল্পে তার হাত নাই; সুদেষ্ণার কিছু ক্ষমতা আছে। করুণাময়ীর সে প্রিয় ছাত্রী। তবু মাটির হাঁস, পাখা, বেনে পুতুল গড়া হাতে মূর্ত্তির মুণ্ড-গড়া সহজ নয়।

একদিন করুণাময়ীর খুব দরকারী চাবির গোছা এমন জায়গায় লুকাইয়া রাখিল, কাহারও সাধ্য হইল না, খুঁজিয়া বাহির করে! শেষে করুণাময়ীর কাছে আসিয়া বলিল, "তুমি যদি আমাদের কার্ত্তিকের মুণ্ডটি খুব মন দিয়ে গড়ে দাও ছোট মা, তাহলে আমি তোমার চাবি খুঁজি!"

পূর্ব্বে এমন ব্যাপারে সুদেষ্ণার কাছে করুণাময়ী অনেক সাহায্য পাইয়াছে। কাজেই না বলিতে পারিল না। সহজে চাবি মিলিল, এবং কার্ত্তিকের মুণ্ড গড়া হইতে লাগিল। এবং একদিন কার্ত্তিকের খড়ে মাথা বসিল। করুণাময়ীর শিল্পীর হাত, যে-কাজে হাত দেন, মন্দ হইতে জানে না। অনভ্যস্ত হাতে মুণ্ড নিতান্ত তুচ্ছ হইল না! দু'জনে তখন বাড়ী মেরামতের জন্য জালায় ভিজানো যে চূণ-মাটি ছিল, ভাঁড়ে ভরিয়া-ভরিয়া আনিতে লাগিল। আনিয়া কার্ত্তিকের সর্ব্বাঙ্গে লেপিতে লাগিল। হরি-তালের রং করার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠিল না। বাড়ীর সরকার হইতে চাকর-মালী কেহই তাদের সেটুকু সহায়তা করিল না। "ও-সব জিনিষ হলো বিষ—ও নিয়ে খেলা করে না—শেষে কি চাকরি খোয়াবো?" তারা সাফ জবাব দিল।

কাজেই কার্ত্তিক চিরকালের হরিদ্রা বর্ণ হারাইয়া শ্বেত হইয়া রহিলেন।

সেজন্য ক্ষতি ছিল না, তারা মহোৎসাহে করুণাময়ীকে গিয়া ধরিল, কার্ত্তিকের পোষাক চাই। করুণাময়ীর পাকা চুলের অভাবে সাদা কম্বলের দু-চারগাছা রোম ছিঁড়িয়া, দু-একটা কাঁচা চুলে টান দিয়া সেগুলো দেখাইয়া পয়সা আদায় করিতেছিল এবং সেই পয়সায় ঝুটা জরি, নকল মতি, কাঁচকড়ার ফুকা দানা কিনিয়া রংয়ে ছোপানো ছেঁড়া কাপড়ে কার্ত্তিকের ধুতি-চাদর এবং আংরাখা তৈরী হইল। সুদেষ্ণাই এ-সব করিল।

এমনি করিয়া এত দুঃখ-কষ্ট-পরিশ্রমে কার্ত্তিক-ঠাকুরের দেহ প্রায় পরিপূর্ণ হইয়া আসিয়াছে, তখন অকস্মাৎ বিনামেঘে বজ্রপাত হইবার উপক্রম! সুদেষ্ণাকে একদল বরপক্ষ দেখিতে আসিয়া জবাব দিয়া গেল, "আমরা শুনেছিলুম, মেয়েটি গৌরবর্ণা···কিন্তু দেখছি, কালোর কাছাকাছি!"

শুনিয়া দাদু খুব বিরক্ত হইলেন, তাদের বিদায় দিয়া ঘটককে মিথ্যা জাঁক করার জন্য মৃদু তিরস্কার করিলেন এবং অন্দরে আসিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ বড়বৌমা, তোমরা যে বলো, সুদেষ্ণা ফর্শা, কই, ওরা যে মুখের উপরে ওকে কালো বলে গেল!"

সুদেষ্ণার মাও এ-খবর পাইয়া বিশ্বের উপর চটিয়াছিলেন, শুধু পাত্র-পক্ষের উপর নয়! তাই এ-প্রশ্নের উত্তরে মনের যত জ্বালা মিশাইয়া তিনি বলিলেন, "ফর্শা কি ও ছিল না? মিথ্যা কথা তো বলিনি, দিন-রাত রোদে পুড়ে বেড়ালে কারো রং কখনো থাকে? কালো বলবে না তো কি বলবে লোকে? লোকের কি দোষ?"

দাদু ঈষৎ অপ্রসন্ন হইয়া কহিলেন, "দিন-রাত মেয়ে রোদে পোড়ে কেন? মা-মরা মেয়ে নয় তো! মা, খুড়ির এতটুকু অবসর নেই, মেয়েটাকে সামলাবে!"

গম্ভীর মুখে ফিরিয়া গিয়া দাদু সুদেষ্ণাকে তলব করিলেন।

শ্বশুরের কাছে সুদেষ্ণার মা প্রাণপণে ধৈর্য্য রক্ষা করিলেও তিনি দৃষ্টি-বহির্ভূত হইবামাত্র আর নিজেকে সম্বরণ করিতে পারিলেন না। ধনুকের ছিলার মতো উৎক্ষিপ্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "মা-খুড়ির বাপেদের সাধ্য আছে, আদুরে নাতনীদের ধিঙ্গিপনা বন্ধ করে! এই সেদিন ইনি বলতে গেছলেন, 'মেয়েরা বড় হয়েছে, নদীতে সাঁতার কাটা ভালো দেখায় না, লোকে নিন্দে করবে'। তাতে উত্তর দিলেন, 'যতদিন আমার বাড়ীর মেয়ে আছে, ততদিন তোমরা নিশ্চিন্ত থেকো —তারপর যা খুশী ব্যবস্থা করো। বললেন, কেন, মেয়েদের কি ডুবে মরা থেকে রক্ষার চেষ্টা করবার দরকার হবে না, না, মেয়ে বইতো নয়, মরে মরুক!' এর পর কে কি বলবে বলো? আর কার কথাই বা ওরা শুনবে?"

সুদেষ্ণাকে দেখিয়া মুখে যা আসিল, নির্ব্বিচারে মা বলিয়া গেলেন, "বুড়োধাড়ি ধিঙ্গী মেয়ে সিঙ্গী চড়ে বেড়াচ্চেন! কে নেবে এমন বউ ঘরে? যত গুণ হচ্চে, রূপও সঙ্গে সঙ্গে খুলছে তেমনই! থাকগে আইবুড়ো থুবড়ো হয়ে! না মন পড়াশুনায়, না ঘরকন্নার কাজে! চব্বিশ ঘণ্টা হৈ-হৈ! দু-চক্ষে দেখতে পারিনে এই সব মেয়ে-মর্দ্দানী! জোয়ান আর্ক হবেন, লক্ষ্মীবাঈ হবেন সব!"

দেখিতে দেখিতে বাড়ীর ছোট-বড় অনেকে আসিয়া জড়ো হইলেন। কেহ বলিলেন, "কোথাকার কার বাড়ীর পুজো-করা এক কার্ত্তিকের কাঠামো ধরে এনে কি কাণ্ডই না করছে! ওকি করতে আছে! ঘণ্টা-কাঁসরের বাদ্যি বাজিয়ে ফুল- চন্দন দিয়ে পুজো ভোগ আরতির ধুম দেখে কে!"

কেহ বলিলেন, "মুটে-মজুরেরমত দিন-রাত নদী আর বাগান করলে মেম-সাহেবের রংও সাঁওতালী হয়ে যায়! নাহলে কর্ত্তার মুখের উপর ওই মেয়েকে লোকে 'কালো' বলে অপমান করে যায়!"

আর-একজন বলিলেন, "ওই কার্ত্তিক হয়েছে যত নষ্টের মূল! দাও ওটাকে বিদায় করে।"

অপর আর-একজন ইহাতেও খুশী না হইয়া মন্তব্য করিলেন, "তাতেই ওরা ঠাণ্ডা হবে, ভেবেছো? কয়েৎ-বেলের গাছ, কাঁচামিঠে আমগাছ, নারকুলে কুলের গাছও তাহলে কেটে ফেলতে হয়!"

"তা না হয় হলো, নদীর জল তো আর ছেঁচে ফেলতে পারবে না। সাঁতার কাটার ধুম কি সব? রোদ আর জল, জল আর রোদ—রূপ ছেড়ে প্রাণ থাকলে বাঁচি!"

গৃহিণী সরাসরি রায় দিলেন, "দাও ও কার্ত্তিকটাকে জলে বিসর্জ্জন—আপদ চুকে যাক!"

সুদেষ্ণা পাষাণ-মূর্ত্তির মত খাড়া দাঁড়াইয়া বকুনি খাইতেছিল; এ-সব কথার একটিও মনে রেখাপাত করে নাই। এমন বকাবকি মাঝে মাঝে তাদের শুনিতে হয়। একদিন একটা মইয়ে চড়িয়া প্রাচীরে উঠিয়া কুল পাড়িয়া, একদিন অমনি করিয়া ছাদে চড়িয়া পাশের বাড়ীর কয়েৎ-বেলের গাছ হইতে পাকা কয়েৎ-বেল আনার জন্য এমনি সমারোহে বকুনি খাইয়াছে! অনেকেই ধিঙ্গী বলিয়াছে—সিঙ্গী বলিয়াছে। এ-সব তো গায়ে সহিয়া গিয়াছে। দেখিতে আসিয়া ও-লোকগুলো কালো বলিয়াছে, তাহাতেও এতটুকু দুঃখ নাই! কিন্তু মায়ের ঐ শেষ কথা—কার্ত্তিক-ঠাকুরকে বিসর্জ্জন দেওয়া—তাহার মাথায় যেন বাজ পড়িল! মায়ের কথায় মালী এখনই বিসর্জ্জন দিবে—ঠাকুরকে রক্ষা করিতেই হইবে।

তাই, মা একদিক দিয়া প্রস্থান করিলে অন্য দিক দিয়া ঝড়ের বেগে সে ছুটিয়া গেল করুণাময়ীর কাছে। করুণাময়ী কোলের ছেলেকে কোলে রাখিয়া তার ডাগর চোখের কোলে কাজল টানিয়া দিতেছিলেন।

সুদেষ্ণা ছুটিয়া আসিয়া করুণাময়ীর পিঠের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। বলিল, "অত করে তৈরী-করা কার্ত্তিক আমাদের জানো ছোট-মা—সে-ঠাকুর আজ গেল!" বলিতে বলিতে সে কান্নায় একেবারে ফাটিয়া পড়িল।

সুদেষ্ণার চোখে সহজে জল পড়ে না—কাঁদিতে তার মানে বাধে! আজ কিন্তু মান-মর্য্যাদা সব ভুলিয়া সুদেষ্ণা কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়িল।

করুণাময়ী বিস্ময়ে ঘাড় ফিরাইয়া তার গায়ে হাত রাখিলেন, সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি রে—কোথায় গেল? ভেঙ্গে গেছে? তা কাঁদছো কেন, আমি জুড়ে দেবো।"

এ-সান্ত্বনার শীতল স্পর্শে সুদেষ্ণার রুদ্ধ অভিমান উত্তাল হইয়া উঠিল। সে বলিল, "ভাঙ্গবে কেন? ভাঙ্গেনি! দেখেছো তো কি সুন্দর সাজিয়ে এত কষ্টে দাঁড় করালুম, এখন কি না বিসর্জ্জন দেবার হুকুম হলো! আগে দিলেই তো হতো, তাহলে আর এত কষ্ট হতো না!"

ছেলেকে মাটিতে বসাইয়া করুণাময়ী ফিরিয়া সুদেষ্ণাকে কোলে টানিয়া লইলেন। মাথার চুলে হাত রাখিয়া স্নেহস্নিগ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন? কি হলো? কে বিসর্জ্জন দিতে বলেছে? বাবা?"

সুদেষ্ণা মাথা ঝাঁকাইয়া ঘাড় নাড়িল, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিল, "না গো না, তোমাদের বাবা অত নিষ্ঠুর নন! বলেছেন, তোমার দিদি—বাড়ীর গিন্নী!"

করুণাময়ী হতাশ হইলেন। বাবা হইলে হয়তো খানিক পরে এ-ব্যবস্থার একটু রদবদল করা চলিত। কিন্তু তা নয়! এখানে হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না!

এদিকে অনিন্দিতার কানেও এ-খবর পৌঁছিতে বিলম্ব হয় নাই। যখন সুদেষ্ণার ডাক পড়িল, তখন হইতেই অনিন্দিতা ভয়ে কাঠ হইয়া আছে—এখনি না তার ডাক পড়ে! যেহেতু, এ-পর্য্যন্ত সুদেষ্ণা একা কখন বকুনি খায় না! যখন যাহা ঘটিয়াছে, একসঙ্গে দুজনের ভাগ্যেই তাহার জন্য বকুনি মিলিয়াছে। তার উপর কার্ত্তিক-ঠাকুরের বিসর্জ্জনের খবর পাইয়া সে ছুটিয়া করুণাময়ীর কাছে আসিল এবং কাঁদিয়া মায়ের পায়ে লুটাইয়া পড়িল।

করুণাময়ী তখন ভয়ে ভয়ে সুদেষ্ণার মার কাছে আসিয়া মেয়েদের পক্ষে ওকালতি আরম্ভ করিয়া দিলেন, "এটা কি ঠিক হবে দিদি? আহা কি পরিশ্রমে ওরা ঠাকুরটিকে তৈরী করেছে, তুমি তো দেখনি! না হয় কোথাও বন্ধ করে রেখে দাও, একেবারে জলে ফেলে দেবে?"

সুদেষ্ণার মা কাত্যায়নীর ক্রোধ তখনও এতটুকু কমে নাই। সবেগে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "তুই-ই আরও প্রশ্রয় দিয়ে ওদের মাথায় তুলছিস্, ছোটবো! শুনলুম, কার্ত্তিকের মুণ্ড তুই করে দিয়েছিস, পয়সা দিয়ে গেঁথে বুনে গয়না-কাপড় জুগিয়েছিস! কোথায় বারণ করবি, তা নয়, নিজে শুদ্ধ ওদের সঙ্গে ছেলেমানুষী খুকী-পানা করবি!"

করুণাময়ী ভয়ে ভয়ে কহিলেন, "এবারটা তুমি মাপ করো, দিদি। চমৎকার সুন্দর ঠাকুরটি হয়েছে! চাবি দিয়ে তুলে রাখো, জলে ফেলো না। ওরা আর রোদে যাবে না।"

বরপক্ষের সে-অপমানের জ্বালা কাত্যায়নীর মন হইতে তখনও এতটুকু যায় নাই, অন্যায়ের প্রতিবাদ অন্যায়ে শোধ করাই তখন তাঁর একমাত্র সদুপায় বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়া আছে। মেয়েদের যে করুণাময়ী অসঙ্গত প্রশ্রয় দিয়া থাকেন, সেজন্য সুদেষ্ণা মায়ের চেয়ে কাকীর বেশী

বাধ্য। সে-কারণে করুণাময়ীর উপর তাঁর একটু অভিমান আছে বরাবর। আজিকার এ-ঘটনার পর যখন বাড়ীশুদ্ধ সকলে তাঁহার পক্ষে দাঁড়াইয়া মেয়েদের বেয়াদবির সহস্র নজীর টানিয়া তাঁহার অপক্ষপাত বিচারের জয়গান গাহিয়াছে, ঠিক সেই সময়ে একমাত্র করুণাময়ীই সেই অপরাধিনী কন্যাদের পক্ষ লইয়াছে দেখিয়া তাঁহার তপ্ত মন আরো তপ্ত হইয়া উঠিল। কঠিন কণ্ঠে তিনি কহিলেন, "দাদুর আস্কারায় মেয়ে দুটি তো এক-একটি দেবী চোধুরাণী তৈরী হচ্ছেন। তার উপর তুমি গতরে খেটে, পয়সা দিয়ে, উড়নচণ্ডী খামখেয়ালী করে তুলছো! এর পর যদি ওরা দেখে, আমি হুকুম দিলেও সে-হুকুম ফিরে নিতে জানি, তাহলে ওদের নিয়ে আর টিকতে পারা যাবে? মিথ্যে অনুরোধ তুমি করো না, ছোটবৌ! আমি যা বলেছি, তা হবেই।"

করুণাময়ী আর কিছু বলিতে ভরসা পাইলেন না। নিঃশব্দে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ফিরিয়া আসিলেন। সুদেষ্ণা তখন একটু আশ্বস্ত হইয়া উঠিয়া বসিয়া খোকাকে লইয়া খেলা করিতেছে, তার কুন্দ-সুন্দর শুভ্র ছোট হাত দুখানি ধরিয়া তালি দিতে দিতে সুর করিয়া বলিতেছে—

"তাই তাই তাই, মামা বাড়ী যাই,
মামী দিলে দই সন্দেশ পথে বসে খাই।"—

খোকা খিল-খিল করিয়া হাসিতেছে, আর জোরে জোরে হাত চাপড়াইয়া আধ-আধ স্বরে উচ্চারণ করিতেছে—

"তাত্তা, তাত্তা, মাম্মা, তাত্তা"

এমন সময় করুণাময়ী আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সুদেষ্ণা সচকিত হইয়া তাঁর মুখের দিকে চাহিল—মুখের ভাবেই ফলাফল বুঝিল। প্রশ্ন না করিয়া সে গুম হইয়া রহিল। মনের এমন অবস্থা

—কাঁদিতে পারা যায় না! এ-ক্ষতির শোধ কি দিয়া তুলিতে পারা যায়, সে শুধু তাই ভাবিতেছিল। মনে হইতেছিল, দিক-বিদিকে ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়ে—কার্ত্তিকের মত বিসর্জ্জনে যায়—প্রায়োপবেশন করিয়া পড়িয়া পড়িয়া মরিয়া যায়! অথচ এগুলার কিছুই করা চলে না!

দাত্নুর কাছ হইতে যখন তলব আসিল, তখন কোনো ভয়-ভাবনা না করিয়াই সে গট-গট করিয়া সোজা গিয়া তাঁহার সামনে দাঁড়াইল। এমন চরম ক্ষতি হইয়া যাইবার পর আর বেশী কি হইবে তার?

দাত্নু কিন্তু রাগ করিলেন না, বলিলেন, "সু-দিদি—কাল থেকে একটা ব্রত করবে? কিন্তু ঠিক একটি মাস নিয়মিত করতে হবে!"

সুদেষ্ণা রাগ-দুঃখ মুহূর্ত্তের জন্য ভুলিয়া গিয়া অভ্যাসবশে নম্র হইল। কহিল, "করবো!"

দাত্নু কহিলেন, "তাহলে কাল সূর্য্য ওঠা থেকে সূর্য্য অস্ত যাওয়া পর্য্যন্ত সারাদিন বাগানের পথে যাবে না। অর্থাৎ, সূর্য্যের কিরণ তোমার গায়ে যাতে না পড়ে, তোমাকে তাই করতে হবে। একে কি ব্রত বলে, জানো?"

ব্রতের বিধান তেমন পছন্দ হইল না। সুদেষ্ণা নীরবে মাথা নাড়িয়া জানাইল, "না।"

দাত্নু বলিলেন, "একে বলে অসূর্য্যম্পশ্যার ব্রত, এর ফল শুনবে?

অসূর্য্যম্পশ্যার ব্রত যে রমণী করে,
হারা রূপ ফিরে পায়, দিব্য রূপ ধরে।"

এত দুঃখেও সুদেষ্ণা হাসিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল মার নিষ্ঠুর বিচারের কথা! এই তো দাত্নু ব্যবস্থা করিলেন—মার কি দরকার ছিল আমাদের এতখানি ক্ষতি করার! মনে হইল, দাত্নুকে

বলে—মাকে বারণ করে দিন, দাদু—আমাদের কার্ত্তিক-ঠাকুরকে যেন বিসর্জ্জন দেওয়া না হয়! তাহা হইলে দাদু হয়তো—

কিন্তু তার পর মা কি আর রক্ষা রাখিবেন? লাগানী বলিয়া যা-তা বলিয়া প্রাণান্ত করিতে ছাড়িবেন না। তাঁর সে কথার খোঁটায় কার্ত্তিক-ঠাকুরকে পাইয়াও জলে ফেলিয়া দিবার জন্য অস্থির হইতে হইবে! থাক, দাদুকে বলিয়া কাজ নাই।

অনিন্দিতার সঙ্গে দেখা হইতে সব কষ্ট পুঞ্জিত হইয়া বারুদের বস্তার মত সশব্দে ফাটিয়া পড়িল! একযাত্রায় এবার এই যে পৃথক ফল ফলিয়া গেল—এর জন্য অনিন্দিতার উপর রাগও কম হয় নাই! অন্যবারে যা শাস্তি হয়, দুজনে ভাগ করিয়া লয়—দুঃখ থাকে না! বরং বকুনি খাইয়া অনিন্দিতা কাঁদে বলিয়া সে তাহাকে "পানসে-চোখি" "কচি খুকি" বলিয়া তামাসা করে, কখনও ভালো কথায় ভুলাইয়া তাহার কান্না থামায়। কিন্তু এবারে এই কার্ত্তিক-ঝড় শুধু তার মাথার উপর দিয়াই প্রচণ্ড তাণ্ডবে বহিয়া গেল—অনিন্দিতার মাথার একটি চুলও তাহাতে নড়িল না! এর নাম বিচার? কেন, কার্ত্তিক কি সে একা ধরিয়াছিল? একা বহিয়া আনিয়াছিল? মাটী আনা, জল আনা, ঠাকুর গড়া, বেদী তৈরী—এ-সব তার একার করা? তবে? যত শাস্তি সে একা পাইবে কেন? 'অসূর্য্যম্পশ্যার ব্রত'! সে এত বোকা! এর মানে, তাকে ঘরে পুরিয়া রাখা! কেন, অনিন্দিতা বুঝি ইন্দ্রের অপ্সরী? সে কালো হইয়াছে—অনিন্দিতা হয় নাই? সে আরও বেশী করিয়া হইয়াছে। সকালে সময় পায় না বলিয়া সে-ই তো দুপুরবেলা সব কাজ সারে! কি-রকম তার চেহারা খুলিয়াছে—ওঁরা তা দেখিতে পান না! যত অত্যাচার তার উপর!

এর মানে অতি সহজ। এর মানে, অনিন্দিতা যে দাদুর আদুরে! ছাই ফেলিতে ভাঙ্গা কুলা আছে এই সুদেষ্ণা! যত-কিছু কুব্যবস্থা তার জন্য!

অনিন্দিতার খোঁজে আসিয়া তাহাকে অসহায়ভাবে একা কাঁদিতে দেখিয়া তার হাড় অবধি জ্বলিয়া উঠিল! সুদেষ্ণা যখন সাত ঘাটের জল খাইয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে, মহারাণী তখন নির্ব্বিকার বসিয়া একমাত্র ব্রহ্মাস্ত্র কসরৎ করিতেছেন! মজা মন্দ নয়!

ঘরে ঢুকিয়াই তাই গায়ের এতক্ষণকার সব জ্বালা উজাড় করিয়া তার এই একটিমাত্র অনুগত প্রাণীর উপরেই ঢালিয়া দিয়া তীব্র কণ্ঠে সে বলিল, "লাট সাহেবের বিবি! দিব্যি খাতির জমা হয়ে বসে আছ! তুমিই তো প্রথম কাত্তিককে দেখতে পেয়েছিলে! তুলে আনবার কথা তুমিই প্রথম বললে! সব সময় সব কিছু মজা করলে, আর যত ঝঙ্কার জড়ো হলো সব আমার ওপোর! আমি তো কারু আদুরী নই তোমার মতো!"

অনিন্দিতা তার কান্নার নদীতে যেটুকু বাঁধ বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছিল, মুহূর্ত্তে টিটকারীর বন্যা সে-বাঁধ ভাসাইয়া দিল। সত্যই তো সুদেষ্ণার উপর অত্যন্ত অবিচার হইয়াছে! কিন্তু সে-অবিচার যে তার দ্বারা হয় নাই এবং কর্ত্তৃপক্ষদের এ-অবিচারের বিরুদ্ধে যে তার করিবার কিছু ছিল না, সে-কথা সে ভাবিতে পারিল না!

অসহায়ের মত অনিন্দিতার এ-কান্না সুদেষ্ণার বিশ্রী লাগিল! কোথায় অদৃষ্ট মন্দ বলিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিবে—যাঁরা বিচার করিয়াছেন, তাঁদের উপর চোখা-চোখা দুটা কথা বলিবে! যে সুদেষ্ণা সে-কথায় প্রাণ ভরিয়া যোগ দিয়া একটু আরাম পাইবে, সান্ত্বনা পাইবে—তার কিছু নয়—শুধু কান্না! রাগিয়া সে ঝঙ্কার

তুলিল, “থামো, থামো খুকী—কাল থেকে আমাকে ওঁরা ঘরে বন্ধ করে রাখবেন আর আহ্লাদী খুকী তখন সারাদিন ধিন-ধিন করে নেচে বেড়িয়ো! বেশ মজা—না?”

অনিন্দিতা সংসার সম্বন্ধে একটু বোকা হইলে কি হয়, বুদ্ধি তার বেশ তীক্ষ্ণ! সে এবার এই পক্ষপাত-দুষ্ট বিচার-ব্যাপারের সূত্র খুঁজিয়া পাইল। তখনই কান্না ভুলিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "তোমার বিয়ে হবে যে, তাই!"

সুদেষ্ণার গায়ে যেন বিষ ছড়াইয়া দিল! রাগিয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া সে তর্জ্জন তুলিল, “চুপ করে থাক্, বিয়ে যেন সাতজন্মে কারো কখনো হয়নি! তোরও যেন হবে না! যত উল্টে শাস্ত্র সব আমার বেলা!”

অনিন্দিতা ধমক খাইয়াও খুব বেশী দমিল না। এতক্ষণকার অমীমাংসিত জটিল প্রশ্নের সহজ সুন্দর উত্তর আপনা হইতেই সে পাইয়া গেছে। শান্তভাবে সে বলিল, “সত্যি, তুমি কালো হয়ে গেছ!”

এ-কথায় সুদেষ্ণা অসহিষ্ণুভাবে চেঁচাইয়া উঠিল, “আর তুমি স্বর্গের অপ্সরীর মতন ফরসা ধপ্ধপ করছো, না? ওসব ছেঁদো কথা রেখে দাও। তুমি এসেছো সাক্ষাৎ সরস্বতী, আর আমি এসেছি মা-লক্ষ্মীর বাহন প্যাঁচা—এই সোজা কথাটা আমি খুব বুঝি। বেশ, তুমি আর আমার সঙ্গে মিশো না, খারাপ হয়ে যাবে! আমি একলা থাকবো।”

কার্ত্তিক-ঠাকুরের বিসর্জ্জন-পর্ব্ব শেষ হইয়া গিয়াছে? সে-কাজ চুকিতে খুব বেশী দেরী হয় নাই। এই মেয়েদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছেলের দল—যারা গড়িতে জানে না, শুধু ভাঙিতে জানে, এ-খবরে তারা

আনন্দে যেন মাতিয়া উঠিল! কার্ত্তিককে বিসর্জ্জন দিবার জন্য তারা পর্য্যন্ত বারে-বারে পূজারিণীদের তাগিদ দিয়াছে—শাস্ত্রের নজির দিয়াছে, পূজা-করা প্রতিমা বিসর্জ্জন দেওয়াই বিধি। কিন্তু পূজারিণীরা এত কষ্টে তৈরী করা ঠাকুরের মমতা কিছুতে ত্যাগ করে নাই। আজ তাদেরই জিত হইল বলিয়া গৃহস্বামিনীর মুখের কথা না খসিতেই দল জুড়িয়া হুর্‌রে ধ্বনি তুলিল। একটা ভাঙ্গা টিন, খোকা-খুকীদের খেলিবার সরঞ্জাম হইতে একটা ডুগ্‌ডুগি আর একটা টিনের বাঁশী আনিয়া তারা কার্ত্তিকের কাছে খুব সোরগোল লাগাইয়া দিল এবং এপাশে ওপাশে চাহিয়া দেখিতে লাগিল যে, কার্ত্তিকের মালিক দুজন এই মহাপর্ব্ব দেখিতে আসিল কি-না! সেজন্য নানা ছলে কিছুক্ষণ তারা অপেক্ষাও করিল। কিন্তু সময় সস্তা নয়, হয়তো এখনি কোথা হইতে কিসের ডাক পড়িবে, কার্ত্তিক-বিসর্জ্জনের হুকুম হয়তো রদ হইবে—তাই আর সময়ক্ষেপ না করিয়া চট্‌পট্ বিসর্জ্জন সারিয়া দেওয়া ভালো। চারজন ছেলে কার্ত্তিক-ঠাকুরকে ধরিয়া লইয়া চলিল—একজন বলিল, "এঃ, ঠাকুরটা মাটী চাপিয়ে চাপিয়ে কম ভারী করেনি!"

বয়োজ্যেষ্ঠ একটি ছেলে বলিল, "বেচারীরা বিসর্জ্জন দেবে বলে তো ঠাকুর গড়েনি, রাখবে বলেই গড়েছিল।"

একজন তীব্র মন্তব্য করিল, "পূজো-করা ঠাকুর কেউ কখনো রাখে? ওই জন্যেই তো ওর বিয়ে ভেঙ্গে গেল!"

ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, হপ্তা দুই-তিন ধরিয়া সুদেষ্ণাকে অসূর্য্যম্পশ্যার ব্রত পালন করিতে হইল এবং হাতে-হাতে তার ফল পাওয়া গেল। অবশ্য খাঁটি ব্রত-পালনই কারণ কি-না, সন্দেহ আছে! তবে এর জন্য মোহিনী-ঝিয়ের পাকা হাতের কসরৎ আর কাঁচা-হলুদ-দেওয়া রূপটানের গুণ ছিল!

অনিন্দিতা ব্রত গ্রহণ না করিলেও তারও এইসঙ্গে দুপুরের রৌদ্রে

বাহির হওয়া বন্ধ ছিল। সেজন্য তারো গায়ের বর্ণে জৌলুশ খুলিল। কার্ত্তিকের বিরহে দুজনেই অত্যন্ত মন-মরা হইয়াছিল, তাদের এ-নিদারুণ ক্ষতির কতক পূরণ করিয়াছিলেন জননী করুণাময়ী। পুঁতির একসেট করিয়া গহনা, মায় মুকুট হইতে পায়ের চরণ-পদ্ম, এমন কি, ছত্রদণ্ড পর্য্যন্ত নিজে করিয়া, কতক উহাদের তৈরী করিতে শিখাইয়া দুজনের মনোবেদনার তিনি কিছু উপশম করিলেন। সেই সঙ্গে কিছু মাটির, কিছু ছেঁড়া কাপড়ের, কিছু কাগজের তৈরী পুতুল আর তাদের শাড়ী-জামা মেয়ে দুটিকে দান করিয়া তাহাদের ম্লান মুখে হাসি ফুটাইয়া তুলিলেন।

শৈশবের ক্ষতি এমনই করিয়া পূরণ হয়। সে-ক্ষতি যেমন তুচ্ছ, তার প্রতিকারও তেমনি কঠিন নয়। কিন্তু জগতে ক'জনই বা তেমন হৃদয় দিয়া সেটুকু অনুভব করে! অভাব ঘটে সেইখানে।

ইহার পর সুদেষ্ণার বিবাহের সম্বন্ধ পাকা হইতে আর বেগ পাইতে হইল না। সুন্দরী সুদেষ্ণার সঙ্গে দাদুর অর্থ ও খ্যাতি মিশিয়া তাহাকে বরণীয়া বধূরূপে পাইতে সহজেই পাত্রপক্ষ উদগ্রীব হইলেন এবং এক যোগ্য পাত্রের সঙ্গে কোষ্ঠী মিলাইয়া বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

অনিন্দিতার পড়াশুনা ভালোই চলিতেছিল। কার্ত্তিক-ঠাকুরের ও-ব্যাপারেও তার পড়াশুনার কোনো ক্ষতি হয় নাই। সেটা বিদ্যা-লাভের ঐকান্তিকতার জন্য নয়—দাদুর আদেশ সে দেবতার বাণী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল—তাই। দাদু বিরক্ত হইবেন, এইটে তাকে সব প্রলোভন হইতে রক্ষা করিত। এদিকে সঙ্গিনীদের মধ্যে তখন পুতুলের ঘরকর্ণায় মেয়ের বিবাহের ধুম পড়িয়াছে। অনিন্দিতার পড়ার রুটীনে টান ধরিল। সুদেষ্ণার মেয়ের বিয়ে—সে বলিল, "পাঁচ-সাত মিনিটে আর কি এসে যাবে? বর-কনে বাসর-ঘরে যাক, তখন যাস।"

অনিন্দিতার কান্না আসিল, বাসর-ঘরে কদম-ঝি (বয়সে তরুণী) দুটা গান গাহিবে, কথা আছে—শুনিবার ইচ্ছা প্রবল। কিন্তু উপায় নাই। সুদেষ্ণা জানে, অন্যের কাছে একান্ত তুচ্ছ হইলেও, দাদুর কাছে তার মূল্য কতখানি! সময়ের এক মিনিট এদিক-ওদিক করা চলে না। ছলছল চোখে সে মাথা নাড়িল, মুখে কোনোমতে উচ্চারণ করিল, "দাদু রাগ করবেন।"

অবশ্য দাদু মুখে বেশী কথা বলিবেন না—শুধু বলিবেন, "ঘড়িটা দেখ!"—তার চেয়ে কঠোর বাক্য বাংলা ভাষায় আছে বলিয়া অনিন্দিতা জানে না!

সুদেষ্ণা চটিয়া উঠিল—কহিল, "বেশ, যা। আমিও তোর মেয়ের বিয়েতে বাসর জাগবো না, দেখিস!"

অনিন্দিতার দু-চোখ ছাপাইয়া জল ঝরিল। কিন্তু এক-দণ্ড দাঁড়াইয়া কান্না সামলাইয়া লইবে, সেটুকু সময়ও হাতে নাই—

লাইব্রেরী-ঘরের ঘড়িতে তিনটা বাজা শুনিয়াছে। সে চলিয়া গেল।

ঠিক কাঁটায়-কাঁটায় তিনটার সময় দাদুর ঘরে পৌঁছিবার কথা। সুদেষ্ণা যে আর এখন দাদুর ছাত্রী নাই, পণ্ডিত-মহাশয় বা মাষ্টার-মশাইএর কাছেও তার সাতখুন মাপ, এ-কথা সে ভুলিয়া যায় এবং অনিন্দিতার অদৃষ্টকেও সেই সূত্রে সে গাঁথিবার চেষ্টা করে। এইখানেই বাধে বিরোধ। অথচ মুখ ফুটিয়া সত্য বলিলেও সে-বিরোধের শান্তি হয় না, উল্টা ফল হয়। সুদেষ্ণা উল্টা অর্থ গ্রহণ করিয়া বলিয়াছে, "সে তো জানি—তুমি হচ্ছো মহাকবি কালিদাস, তুমি হচ্ছো মহা-সরস্বতী, তোমার সঙ্গে আর আমার সঙ্গে?"

অগত্যা নীলকণ্ঠের মত সুদেষ্ণার অভিমানের সকল বিষ অনিন্দিতাকে গ্রহণ করিতে হয়। নিজের অক্ষমতার অপরাধকে নিজেই যেন সে সময় সময় মার্জ্জনা কবিতে পারে না। যে কৃতিত্ব সুদেষ্ণা আর তার মধ্যে দিনে দিনে আড়াল রচিয়া তুলিতেছে, তার পক্ষে তাহা যত সম্মানেরই হোক, তাহাকে অমান্য করিবার মত মানসিক বল অবশ্য সুদেষ্ণার মত তার নাই। কিন্তু তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার ইচ্ছা যে একেবারে হয় না—এমন নয়।

অথচ মনের মধ্যে এই ধূমায়িত বহ্নির জ্বালা বহিয়া নিতান্ত নিরীহের মত সে পুঁথিপত্র লইয়া দাদুর কাছে পড়িতে বসে এবং কখন তার মধ্যে একেবারে নিমজ্জিত হইয়া সে সব ভুলিয়া যায়; এবং দাদুর সপ্রশংস দৃষ্টিসুধায় খুশী-মনে হাসি-মুখে ফিরিয়া আসে।

ওদিকে পুতুলের বিবাহোৎসব চুকিয়া গিয়াছে। কদম তার রান্নাঘরের কাজকর্ম্মের বাঁধা-সময় হইতে একটু সময় কাটিয়া লইবে, বড় মায়ের ভয়ে এমন সাধ্য তার নাই! অথচ কদম না থাকিলে বাসরের গান জমিবে কেমন করিয়া?

অনিন্দিতা আসিয়া ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিয়াই বুঝিতে পারিল, বাসর-ঘরের পর্ব্ব শেষ হইয়া গিয়াছে। বর ও কন্যাযাত্রীরা ভূরিভোজনে তৃপ্তি লাভ করিয়া যথাস্থানে ফিরিয়া গিয়াছে। অর্থাৎ প্রতিবেশিনী মিনি, প্রমীলা, পক্ষী—নিজের নিজের পুতুল লইয়া চলিয়া গিয়াছে। বিবাহ-বাটী প্রায় শূন্য। শুধু নন্দিনীর বাড়ীর পুতুল-পুরুষরা বাড়ী ফিরিলেও মেয়ে-পুতুলরা অনিন্দিতার পথ চাহিয়া পড়িয়া আছে।

অনিন্দিতার চোখে আবার জল আসিল। তার জন্য এক ঘণ্টা কেহ অপেক্ষা করিতে পারিল না! রাগে সে গুম হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কাহাকেও একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে রুচি হইল না। হয়তো সাহসও হইল না—পাছে চোখের জল আর চোখে চাপিয়া রাখা না যায়!

নন্দিনী-মেয়েটি চিরদিন অনিন্দিতার ভক্ত। লোকে তাহাকে জাহাজের পিছনে গাধাবোট বলিয়া তামাসা করে। অনিন্দিতার দুঃখ সে মর্ম্মে-মর্ম্মে বুঝিল—নিমন্ত্রিতাদের অকাল-প্রস্থানের প্রতিবাদও সে করিয়াছিল, কিন্তু মায়ের কাছে বকুনি খাওয়ার যুক্তিতে তো আর কোনো-কিছু খণ্ডন করা যায় না! অগত্যা দু-একটা ক্ষীণ বাদ-প্রতিবাদের পর তাহাকে নীরব হইতে হইয়াছিল। মুখরা মিনি যখন মুখ নাড়িয়া জবাব দিল, "আহা গো, তোমার অনিদির দাদুর ভয় আছে, আর আমাদের বুঝি কোনো ভয় নেই? কেন, আমাদের গায়ে গণ্ডারের চামড়া না কি?"

অনিন্দিতার উপর সুদেষ্ণা মনে মনে চটিয়া ছিল, তার খাতিরে ইহাদের সে কেন আটকাইবে? কাজেই বড় আশা করিয়া আসিয়া অনিন্দিতার মুখ চূণ হইয়া গেল! সুদেষ্ণা পর্য্যন্ত বর-কনেকে বাসর জাগিতে বসাইয়া সরিয়া পড়িয়াছে। সে যে ইচ্ছা করিয়াই তাহাকে তাচ্ছিল্য দেখাইয়া প্রতিশোধ লইবার জন্য এ ব্যবস্থা করিয়াছে, তাহা

বুঝিতে অনিন্দিতার বাকি রহিল না। কিন্তু কি করিবে? সে নিরুপায়—দাতুর অবাধ্য হইবার সাধ্য তার নাই।

হাবা-গোবার মত দেখাইলে কি হয়, অনিন্দিতার বুদ্ধি মন্দ ছিল না। সুদেষ্ণাকে জয় করিতে কি মন্ত্রের প্রয়োজন সে জানিত। একটা মুক্তো-পুঁতির শতেশ্বরী হার সুদেষ্ণার ছিল লোভের বস্তু। সুলতার কাছ হইতে এটি উত্তরাধিকারসূত্রে সে পাইয়াছে এবং সেই জন্যই সুদেষ্ণার বিশেষ আগ্রহ দেখিয়াও না বুঝিবার ভাণ করিয়া এটী সে সযত্নে কাশীর ছোট পিতলের বাক্সে তুলিয়া রাখিয়াছিল; সাধ্যপক্ষে সেখান হইতে বাহির করিত না। আজ নিজে অনিবার্য্য অপরাধের স্খালন-চেষ্টায় মরিয়া হইয়া সে তার পুতুল-কন্যা বিদ্যুৎলতার গলা হইতে সেই মালা খুলিয়া আনিয়া সুদেষ্ণার সদ্য বিবাহিতা কন্যার গলায় পরাইয়া দিল। সুদেষ্ণার মনেও খুব শান্তি ছিল না। অনিন্দিতাকে শাস্তি দিবার জন্যই সে এ-ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেও দূরে সরিয়া যাইতে পারে নাই।

জানালার পাশ হইতে এই অপ্রত্যাশিত দান দেখিয়া দ্রুতপদে সে ঘরে আসিয়া ঢুকিল। মনের আনন্দ চাপিতে না পারিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল,—"এই অনি! তোর হলো কি রে? হঠাৎ ওটা আমার লাবণ্যকে দিয়ে দিলি যে?"

এক নিমিষে সুদেষ্ণার রাগ গেল চলিয়া! অনিন্দিতা বুঝিল সে ঠিক ঔষধ দিয়াছে। তাই খুশী হইয়াই বলিল,—"আমার বিদ্যুৎলতা ওর বোন্‌ঝিকে ওটা প্রেজেন্ট করলে।"

সুদেষ্ণা আসিয়া তার উৎসর্গ-করা মেয়ের গলা হইতে মালাগাছি এক রকম ছিনাইয়া লইয়া বাড়ীর গিন্নীর গলায় পরাইয়া দিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "ইঃ! তাই অমনি ওকে আমি দিলুম কি না! মিনিটা যা হ্যাংলা, বউএর জিনিষ বলে নিয়ে নেবে না।"

তার পর ঈষৎ ভাবিয়া আবার বলিল, "এই নন্দি, খবর্দ্দার, কারু কাছে বলে ফেলিস্‌নি যেন যে, বিদ্যুৎ হারটা লাবণ্যকে দিয়েছিল! অনিন্দিতা তুইও বলবিনে—খবর্দ্দার!"

নন্দিনী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমি বলে দেবো।"

সুদেষ্ণা রাগিয়া গেল, চোখ পাকাইয়া বলিল, "বললে তোকে মেরে ফেলবো না! দেখনা একবার বলে!"

তারপর সদয় কণ্ঠে অনিন্দিতাকে বলিল, "তুই কি বলিস্? মেয়েকে অত অত সব দিয়েছি,—এর মধ্যে আবার অত দামী একটা জিনিষ কিসের জন্যে দিতে গেলুম বল্ তো? মেয়ে বলে রাজা না কি! তুই কি বলিস্—ঠিক কি না?"

অনিন্দিতা মাথা হেলাইয়া সায় দিল—সুদেষ্ণার মেয়েকে খুশী করা তার গরজ নয়; সুদেষ্ণা যাহাতে খুশী হয়। কিন্তু নন্দিনী এ যুক্তি গ্রহণ করিল না, সে একটু টেপা হাসি হাসিয়া বলিল, "হুঁ, কথা খুব ভালো, কিন্তু মানুর মাও তো ঐ কথা বলতে পারে! শুন্‌লে খুব আহ্লাদ হবে। হবে না, অনিদি?"

সুদেষ্ণা ভ্রূকুটি করিল, কিন্তু মালাগাছি নিজের আঁচলের খুঁটে গিঁট দিয়া বাঁধিল। কাজ কি সামনে রাখিয়া, যদি কোন রকমে মেয়ের শাশুড়ীর কানে কথাটা ওঠে! এমন জিনিষ কি পরের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া যায়! বিশেষ পারিবারিক সম্পত্তি হিসাবে যে জিনিষটার মূল্য আছে!

অঘ্রাণ মাসে অনেক বাড়ীর কুমারী মেয়ে বৈকালে গা ধুইয়া বাগানে ফুল তুলিতে আসে—সেঁজুতির ব্রত করিবে। অনিন্দিতারা সারা কার্ত্তিক মাস ধরিয়া বাগানে পুকুর কাটিয়া যমরাজা, যমের

মা, যমের স্ত্রী, চিত্রগুপ্ত হইতে ধোপা-ধোপানী, খুলি খর্ত্তালী ও কাগা বগা পর্য্যন্ত মাটী দিয়া গড়াইয়া, পুকুরের মধ্যে হিলঞ্চা, কলমী ও বিল্ববৃক্ষ রোপণ করিয়া যম-পুকুরের ব্রত করিয়াছে। অগ্রহায়ণে ইতু পূজা। সুদেষ্ণা আর অনিন্দিতা সংক্রান্তির দিন ইতুর ব্রত-কথা শুনিয়া পারণ করিল। সেঁজুতি ব্রত নাকি ভারি চমৎকার! সে ব্রতে সমারোহের সীমা নাই, অথচ তেমন খরচের ব্যাপার নয়! পাড়ায় প্রায় সব মেয়েই করে। পাড়ায় বেড়াইতে যাইবার হুকুম নাই যে চোখ ভরিয়া দেখিয়া আসে! জ্যাঠাইমার কাছে হুকুম চাহিতে চর পাঠাইল, ব্রত করিবার অনুমতির জন্য। কিন্তু আশায় নিরাশ হইতে হইল। তিনি বলিলেন, "সতীন না হয়—তার-জন্য ও ব্রত! সেকাল আর নেই রে বাপু! অমন উদ্‌ভূট্টু বস্তু করতে হবে না। মাগো কি সব মন্তর।"

ঠান্‌দি পাশে ছিলেন—তিনিও সায় দিয়া বলিলেন—"সত্যি, ও সব সতীন-কাঁটার ব্রত একালে নাকি কেউ করে! এখন মানুষ একটা বিয়ে করে খেতে দিতে পারে না—একটার উপর আর একটা! না, না, ও ব্রত করবে কি!"

অনিন্দিতার জ্যাঠাইমা বলিলেন—"তাই তো। এদিনে সতীন হইবার সম্ভাবনা যখন নাই, তখন তার কুশপুত্তলি দাহের ব্যবস্থা নিষ্প্রয়োজন।" মিনিরা নূতন নূতন মন্ত্র জুড়িয়া এ ব্রতটিকে আধুনিক করিয়াছে। ওরা বলে,—

"রস করারে রসকরা,—
বর যেন হয় পাশ্‌-করা।"

অনিন্দিতাদের সেঁজুতি করা ঘটিল না! মিনি ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, "তোমরা ভাই খিরিস্তান।"

সুদেষ্ণা চোখ কপালে তুলিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, "কি বললি! আমরা খৃষ্টান! বোশেখ মাসে পুণ্যিপুকুর, দশপুত্তুল, হরির চরণ, জ্যৈষ্ঠে চাঁপা চন্দন, অশোক পাতা, কার্ত্তিকে যম-পুকুর করিনি আমরা?"

মিনি চোখ মটকাইয়া ঠোঁট টিপিয়া জবাব দিল, "হুঁ-উ! সেই জন্যেই ত বল্‌ছি 'হাফ' মান্‌বো কি—মান্‌বো তো সব মান্‌বো, না মান্‌বো, কিছু মান্‌বো না! তোমাদের বাড়ী না হিঁদু, না সাহেবী—দু' নৌকোয় পা দিয়ে আছো—ওতে কি হয়, জানো?"

সুদেষ্ণা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "কি হয়?"

মিনি বাঁকা হাসি হাসিয়া কহিল, "ডুবে মরা।"

রাগে সুদেষ্ণা সিংহীর মত গর্জ্জিয়া উঠিল, "মরি মরবো, আমরা মরবো, তোমার কি? ফের যদি অমন কথা বল্‌বে তো মেয়ের বিয়ে ফিরিয়ে নেবো,—হ্যাঁ, বলে দিচ্ছি।"

মিনিও কম মেয়ে নয়! সে তার বেয়ানের ভয়-দেখানোতে দমিল না, বরং আরো উৎসাহিত হইয়া সতেজে উত্তর দিল, "বয়ে গেল! নাও গে ফিরিয়ে! তোমরা মুসলমান, তালাক্ দিইয়ে ঐ মেয়ের আবার বিয়ে দিও। ঐ জন্যেই বলেছিলুম, পুরো-হিঁদু তোমরা নও।"

সুদেষ্ণা রাগে ফুলিয়া উঠিল! কিন্তু কলহশাস্ত্রে পাড়ায় মিনির জোড়া নাই। মুখ অন্ধকার করিয়া সুদেষ্ণা তাই গম্ভীর হইয়া রহিল।

মিনি বিজয়ী সেনাপতির মত সগর্ব্বে চাপা হাসির মধ্য দিয়া পূজার ফুল তুলিতে লাগিল। বিবাহ ফেরত দেওয়া-দেওয়ির কথা আর উঠিল না। উভয় পক্ষই এ বিবাহ ভাঙ্গাচোরা করিতে

খুব বেশী ইচ্ছুকও ছিল না। সুদেষ্ণার মেয়ে পুতুলটির ও জিনিষ-পত্রগুলির দাম আছে। আবার মিনি কনের মা বেয়ানকে যে নমস্কারী শাড়ী দিয়াছে—সে শাড়ীও আলাদীনের দৈত্য ছাড়া আর কাহারও আনিবার সাধ্য ছিল না! সে দুটী মিনির ঠাকুরমার বিবাহের বেনারসী শাড়ীর আঁচলের কাঁটা টুক্‌রা। বৃদ্ধা গত বর্ষায় যখন তাঁর চিরকালের রক্ষিত প্রিয় বস্তুগুলি পোকার হাত হইতে রক্ষার চেষ্টায় রৌদ্রে দিয়া ঝাড়িয়া তুলিতেছিলেন, সেই সময় কাঁচি দিয়া কাটিয়া এই দুর্লভ বস্তু মিনি সংগ্রহ করিয়াছে। এমন জিনিষ আর কাহার ঘরে থাকিতে পারে? বিবাহ-বিচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে জিনিষটী হারানো অনিবার্য্য। শুধু সেই কথা ভাবিয়া সুদেষ্ণা এ যাত্রায় তার বেয়ানের ধৃষ্টতা ক্ষমা করিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

এদিকে এই সব ছোটখাট ব্যাপারের মধ্য দিয়া সুদেষ্ণার বিবাহের দিন আসন্ন হইল। পাকা দেখার ভোজ সমারোহ সমাধা হইয়া বিবাহের উদ্যোগ-আয়োজন সাড়ম্বরে চলিতে লাগিল। দাদু প্রত্যেক নাতিনীর বিবাহে সামাজিক বিলি করেন। এবারও তাহার ব্যতিক্রম হইল না। ঝক্‌ঝকে কাঁচের মত মানকরের দেশী চিনির 'ওলা' বিখ্যাত। বগিথালা এবং এক সেট বাটীর সঙ্গে সেই মিষ্টান্নের সমাবেশ করিয়া এক হাজার সামাজিক বিলি আরম্ভ হইল। স্বর্ণকার নূতন ছাপা নমুনার খাতা লইয়া আনাগোনা করিতেছিল, কিছু নূতন প্যাটার্ণ ও কিছু কিছু এ বাড়ীর আগেকার নমুনা হইতে মিলাইয়া অলঙ্কার গড়া হইতে লাগিল। সোনার দর তখন বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। বাইশ টাকা করিয়া গিনি সোনার ভরি। কুটুম্বরা নগদ একটু বেশী চাহিয়াছেন বলিয়া সোনার হিসাবেও নেহাৎ কম করেন নাই। আশি ভরি সোনা এবং একশো ভরি রূপার অলঙ্কারের ফর্দ্দ দিয়াছেন। এ ছাড়া বরের ষোল-ভরির মোটা গার্ড চেন, ঘড়ি, হীরার আংটি, রূপার আর কাঁসার দান-সামগ্রী, নমস্কারী, এ সব আছে। একটু দূরের পথ বলিয়া শুধু খাট-বিছানা লইতে অগত্যা রাজী হইয়াছেন,—শয্যা না দিয়া তো কন্যা দান করা চলে না।

সুদেষ্ণার বয়স বছর চৌদ্দ—অনিন্দিতার মতই সংসারের সম্বন্ধে সে কিছুই জানে না—কোন খবরও রাখে না। কপালকুণ্ডলা জাতের মেয়েও নয়। ও বয়সে তখনকার দিনের বড় ঘরের বড় সংসারের মেয়েরা যেমন হইত, সেও মোটামুটি সেই রকম। বিবাহের খবরে আহ্লাদ হয়তো মনে মনে হইয়া থাকিবে, কিন্তু লোকের কাছে পাছে

জানাজানি হইয়া যায়, সেই ভয়ে খুব সংযত ভাবেই নিস্পৃহ গোছ আছে। আড়চোখে সবই দেখে—অথচ দেখায়—যেন এ-সব ব্যাপারের সঙ্গে তার কোন যোগ নাই! গহনা কাপড়চোপড় দেখিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইলেও যে-দিকে ও-সব ব্যাপার চলিতেছে, কোন মতে সে সেদিক মাড়াইতে চায় না! কৌতূহল যখন অদম্য হইয়া ওঠে, তখন অনিন্দিতাকে আড়ালে ডাকিয়া কূট প্রশ্নে দু'একটা কথা বাহির করিয়া লয়। বেনারস হইতে শাড়ীর পার্শেল আসিয়াছে, সে খবর সে শুনিয়াছে। অনিন্দিতাকে আজকাল সহজে পাওয়া যায় না—কোথায় যে লাফাইয়া বেড়ায়, পাওয়া ভার!

সুদেষ্ণা মনে মনে চটিল। রাগ করিয়া নিজের মনকে শুনাইয়া বলিল, "বয়ে গেল, বয়ে গেল, ভারী তো, ইস্! নাই বা উনি এলেন আমার কাছে! নাই বা দিলেন দুটো খবর! বললে আজকে জানতুম, না হয় দুদিন পরে নিজের চোখে দেখবো। তার জন্যে হয়েছে কি? ওঃ—, মেয়ের পায়া ভারি হয়ে উঠেছে!" অথচ একথা মনে করিয়া চুপচাপ বসিয়া থাকাও যায় না। তারই জিনিষপত্র পাঁচজনে মিলিয়া এ ঘরে সে ঘরে বসিয়া দেখাদেখি করিতেছে—অথচ তাহাকে একটিবার ডাকিয়া কেহ দেখায় না! তাঁর পছন্দ-অপছন্দ জিজ্ঞাসা করার ধার দিয়াও কেহ চলে না। আশ্চর্য্য ব্যাপার! নিজে যদি কোথাও এতটুকু উঁকিঝুঁকি মারিল, অমনি দিদির দল ক্ষ্যাপাইয়া অস্থির করিবে! দুঃখে সুদেষ্ণার চোখ ছলছল করিতে থাকে।

খানিক পরে হন্তদন্ত হইয়া অনিন্দিতা ছুটিয়া আসিল। মুখে চোখে উত্তেজনা, কণ্ঠে আনন্দ। বোধ হয়, বেশ একটু দূর হইতে ছুটিয়া আসিয়াছে—হাঁফাইতেছে। সুদেষ্ণাকে দেখিয়া আহ্লাদে দু-হাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "ও ভাই, তোর বিয়েতে

যে বেনারসী শাড়ী এসেছে, দেখলে এখনি তোর পরতে ইচ্ছে হবে। সত্যি!"

অনিন্দিতার পায়ের শব্দ পাইতেই সুদেষ্ণা অভিমানে মুখ ভার করিয়া, লোভাতুর চিত্তকে চোখ রাঙ্গাইয়া বলিয়াছিল, খবরদার! অনি যেন না ভাবে, ওকে না হইলে আমার চলিবে না!

কিন্তু এ খবর কানে শোনার পর কোনো মানুষ চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। সাগ্রহে মুখ তুলিয়া সে প্রশ্ন করিল, "কি রং রে!"

তার একটু ভয় ছিল, পাছে লাল রংয়ের শাড়ী হয়। লাল রং যদিও তাকে বেশ মানায়, সে জানে,—তবু লাল রংটা তার তেমন পছন্দ নয়।

এ প্রশ্নে অনিন্দিতার চোখে-মুখে আনন্দের দীপ্তি ফুটিল—দু'হাতে সুদেষ্ণাকে ধরিয়া ঝাঁকুনি দিয়া সে বলিল—"বেগনী রং—ভারী চমৎকার, ভাই! এতখানি চওড়া পাড়—তার উপর আবার ঝুমকো ফুলের জঙলা। যে দেখছে সেই বলছে, দিদির শাড়ীর চেয়েও তোর শাড়ীর কাজ আর রং ঢের সরেস।"

সুদেষ্ণা মনে মনে খুশী হইয়া অনিন্দিতার উড়ন্ত কুচো চুলগুলা হাত দিয়া একটু সংযত করিয়া দিতে দিতে বলিল, "আচ্ছা ভাই, জোড়টা কি রংয়ের?"

অনিন্দিতা একটু হতভম্ব থাকিয়া তারপর হাসিয়া কহিল, "কার? তোর বরের? সেও ওই বেগুনী—একই রং তোর সঙ্গে।"

সুদেষ্ণা সলজ্জভাবে একটু হাসিয়া চুপি চুপি কহিল, "ও রং ভাই মোটে মানায় না। দেখলি না মিনির বিয়েতে, লাল শাড়ীর সঙ্গে বেগনী জোড়! গাঁটছড়ার চাদরখানা শেষ পর্য্যন্ত আমার ঘাড়ে চড়ে বসবে! বড় বিশ্রী দেখায়—না? আচ্ছা, তুই বল্?"

অনিন্দিতা বলিল, "তুই তো মিনির মতো কালো নোস্! ওতেও তোকে মন্দ দেখাতো না! তা'তো হয়নি! তবে তোর ওড়নাখানার রং আর একটু ফিকে-গোলাপী হলে কিন্তু আরো মানানসই হতো!"

সঙ্গিনীর কথায় সুদেষ্ণার আসন্ন প্রিয়-মিলনের আশায় প্রফুল্ল চিত্ত আরো প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। কিশোরী সুদেষ্ণার মনে-প্রাণে এক নূতন চিন্তা নব প্রেমের প্রতীক্ষায় উৎসুক হইয়া রহিয়াছে! তার চিরদিনের সহচর কেমন মানুষ—কেমন তাঁর রূপ—এ খবর পাইবার জন্য তার মন যেমন আকুল, তাঁর মনও এমনি অধীর কি না জানিবার ইচ্ছা হয়! সে কি সুদেষ্ণাকে দেখিয়া খুশী হইবে? পছন্দ করিবে? সুদেষ্ণা যে রূপসী, এ-কথা সে জানে, কিন্তু মানুষের রুচিভেদ আছে তো। সকলের চোখে সকলের রূপ এক রকম লাগে না। সুদেষ্ণার সম্বন্ধে এ-বাড়ীতেই মতভেদ আছে। অনেকে বলে, নাকচোখ খুঁটিয়া দেখিলে অনিন্দিতা বেশী সুন্দর, কিন্তু সুদেষ্ণার একটা আলগা-ছিরি বা চটক আছে! তা'ছাড়া তার রং অনিন্দিতার চেয়ে ফর্শা। 'সর্ব্বদোষ হরে গোরা'!

যথাকালে শুভদিনে শুভ সুতহিবুকযোগে গোধূলি-লগ্নে সুদেষ্ণার শুভ-বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। সুদেষ্ণার বি-এ পাশ করা বর দেখিতে ভালো—তবে সবমানুষ তো আর মানুষের হাতে-গড়া এক ছাঁচে ঢালাই-করা জিনিষ নয় যে সকলে একই রকম হইবে! আগেকার জামাই দু'টির সঙ্গে তুলনা করিয়া বলিতে হয়, এ-জামাই তাদের মত অত সুশ্রী বা সুন্দর নয়। রং একটু শ্যামলা, মুখ-চোখ-নাক গ্রীক আদর্শের না হোক—সুস্থ, সবল, বেশ পুরুষোচিত। মুখের ভাব কেমন যেন আত্মভোলা ধরণের!

স্ত্রী

বাসর-ঘরে মেয়েরা খেদ করিতেছিল, "এমন বেরসিক কাটখোট্টা জামাই কোথা থেকে বড় কর্ত্তা খুঁজে আনলেন গো!"

উত্তরে জানা গেল, ছেলেটি সত্যই একটু খোট্টাই মেজাজের। বাংলার বাহিরে তিন পুরুষের বাস—চাল-চলনে একটু হিন্দুস্থানী ভাব।

বাসরে বর গান করা দূরে থাকুক, রসিকাদের সরস বাক্যাবলীর রসও তেমন জমিতে পারিল না। কথাবার্ত্তা যেটুকু কহিল—তাহাকে দার্শনিক আলোচনা বলিলে অন্যায় হইবে না! রূপসী তরুণীদের হাসির রোলে—তাহাদের বিরামহীন বাক্য-শরে জর্জ্জরিত হইয়া বর শেষে পাশ ফিরিয়া চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল। শয়নকালে গম্ভীরকণ্ঠে উপদেশ দিল,—"দেখুন, অত করে হাসবেন না। আর অনর্থক এত কথা কেন কইছেন? এতে আয়ু-ক্ষয় হয়, তা কখনো ভেবে দেখেছেন?"

সুদেষ্ণার মাসতুত বোন পদ্মা বলিল, "তাই নাকি! এমন তো কখনও শুনিনি। তা হ্যাঁ ভাই বর,—এ কি তোমার ফিলজফির প্রোফেশর তোমায় শিখিয়েছে, না, নিজেই আবিষ্কার করে ফেলেছো?"

হাসিয়া মিনি বলিল, "তাই যদি, তাহলে ক্লাশে দাঁড়িয়ে তিনি বক্তৃতা দেন কোন্ ভরসায়? তাঁর আয়ু-ক্ষয় হয় না? তাঁকে জিজ্ঞেস করো দিকি।"

কল্যাণী মুখ টিপিয়া মন্তব্য করিল,—"হলেই বা কি করতেন, বলো? পেট কা ওয়াস্তে সব-কুছ করণে হোতা হ্যায়, জী!"

বর মাথা তুলিয়া সানন্দে বলিয়া উঠিল, "বাঃ! আপনি তো খাসা হিন্দী বলতে পারেন! কোথায় শিখলেন?"

নন্দিনীর বড়দিদি কল্যাণী তার মুন্সেফ স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে বিহারের

নানা দেশে ঘুরিয়াছে। এখন জামালপুরে থাকে,—সে পরিচয় দিয়া পদ্মা প্রশ্ন করিল, "হাসলে, কথা কইলে, আয়ু-ক্ষয় হয়, এ-বিদ্যে আপনার মাথায় কে দিয়েছে বলতেই হবে! বলুন, শুনি।"

তখন সপ্তরথী-পরিবৃত অভিমন্যুর মত অসহায় বর হতাশ ভাবে উত্তর দিল,—"মানুষের কমন সেন্স, অর্থাৎ স্বাভাবিক বুদ্ধি বলে একটা জিনিষ আছে। সেই কমন সেন্সই বলে, সব জিনিষের একটা লিমিট্ অর্থাৎ সীমা আছে,—সেটাকে যত কৃপণের মত রেখে-ঢেকে খরচ করবে, ততই সেটা থাকবে! নাহলে, অপব্যয়ে শীঘ্রই বিনষ্ট অর্থাৎ কিনা ফুরিয়ে যাবে! এ একটা ভয়ানক সত্য তত্ত্ব।"

মিনি তেমনি কলস্বরে হাসিয়া উঠিল,—হাসিতে হাসিতে বলিল, অর্থাৎ আপনি আস্ত পণ্ডিত-মূর্খ! পড়েছেন বিস্তর কিন্তু শেখেননি কিচ্ছু! এটিও একটি ভয়ঙ্কর সত্য তত্ত্ব!"

চারিদিক্ হইতে পুরাঙ্গনাদের হাস্য-তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সুদেষ্ণা অবগুণ্ঠনাবৃতা নব-বধূ—এতক্ষণ ইহাদের বেহায়াপনা আর বেয়াদবিতে মনে মনে বেশ চটিতেছিল, এখন সেও না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া কোনমতে সে হাসি চাপিল।

বর কিন্তু হাসির ধারও ধারিল না। বেশ গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, "দেখুন, 'নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে।' আপনারাও তাই করলেন,—তা ভালোই করলেন! আমার মত মূর্খের বাক্যব্যয় করবার স্থান এ নয়,—কারণ নীতিশাস্ত্রে বলেছে, 'তাবচ্চ শোভতে মূর্খ যাবৎ কিঞ্চিন্নভাষতে!' অর্থাৎ..."

পদ্মালয়া যেন কত আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে—এমনিভাবে শিহরিয়া বলিল, "দোহাই আপনার! আর অর্থাৎ টেনে আনবেন না। অর্থাৎ আমরা আর আপনার ওই 'অর্থাৎ' বরদাস্ত করতে পারছিনে! তার

চেয়ে বরং তিলোত্তমাদিদির একটা গান শুনুন—শুনলে নিশ্চয় অবাক হয়ে থাকবেন—তাতে আয়ু বাড়বে! এখানে সেইটেই আমাদের সবচেয়ে কাম্য।"

আবার একচোট হাসির তরঙ্গ উঠিল। বারকতক মামুলী গলাভাঙ্গা, অনভ্যাস ইত্যাদি ওজর দেখাইয়া শেষে বাড়ীর এক আত্মীয়ের মেয়ে মধুরকণ্ঠে গান ধরিল—

কত নিশি কেঁদে পেয়েছি এ চাঁদে
চাঁদ আজ আর তুই যাস্ নে রে!

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

করুণাময়ী বহুকাল পরে ক'দিনের জন্য বাপের বাড়ী বেড়াইতে আসিয়াছেন। করুণাময়ীর পিতামহ কলিকাতার ধনী-সম্প্রদায়ে নামজাদা ব্যক্তি ছিলেন। স্বনামধন্য পুরুষ। কুলীনের সন্তান—মাতামহের সংসারে প্রতিপালিত হইয়া ওকালতী পাশ করিয়া হাইকোর্টে পরে সুপ্রীম কোর্টে ওকালতী করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। চকমিলানো প্রকাণ্ড বাড়ী—দাস-দাসী, মহাসমারোহে পূজা-পার্ব্বণ—তার উপর বহু আশ্রিত-আত্মীয়কে পালন—বাড়ীতে সব সময়ে যেন সমারোহ লাগিয়া থাকিত। সেকালের ধনী-গৃহে এইটিই ছিল বৈশিষ্ট্য। আপনি আর কোপনি—এ নীতি তখনকার ধনী-সমাজে ছিল দুর্লভ—ধারণার অতীত। আশ্রিত-পালনে গৃহস্বামী, গৃহিণী বা ছেলেমেয়েদের এতটুকু দ্বিধা বা বিরাগ ছিল না। ধনে-মানে পিতামহ ছিলেন সেকালের একজন অসাধারণ মানুষ।

তাঁহার মৃত্যুর পর ছেলেরা পিতার সব আদর্শই প্রায় পালন করিয়া চলিতেন, কিন্তু উপার্জ্জনের উপায় বদলাইয়া তেলের কল, কাপড়ের দোকান এমনি নানা ব্যবসায়ে অর্থ ঢালিয়া প্রথমে প্রচুর লাভ—কিন্তু পরিশেষে ক্ষতিগ্রস্ত হন। এবং এই ক্ষতি উপলক্ষ্য করিয়া সুখের সংসারে ফাট ধরিল; ভ্রাতৃ-বিরোধের সূচনা হইল। করুণাময়ীর পিতা নিজের চেষ্টায় গঠিত ব্যবসাগুলির সব দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে লইয়া বিপুল পৈতৃক সম্পত্তির দাবী ছাড়িয়া প্রায় শূন্যহাতে বাটী ছাড়িয়া আসিয়াছিলেন। শ্যামবাজারে ছোট বাসা লইয়া নূতন করিয়া ব্যবসা পত্তন করিয়া তাহার আয়ে সংসার চালাইতেছিলেন। এবং সেই বৎসর সেই

গৃহেই অনিন্দিতার জন্ম হয়। সুলতা জন্মিয়াছিল মাতামহের পৈতৃক গৃহে।

তারপর করুণাময়ীর পিতা অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। করুণাময়ীর মা শ্যামা দেবী বাপের এক সন্তান। বিধবা হইয়া তিনি মা-বাপের কাছে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁর কনিষ্ঠা কন্যারও বিবাহ হইয়া গিয়াছিল; এবং বৈধব্যের অব্যবহিত পরেই দ্বিতীয়া কন্যা দুরন্ত কলেরা-রোগে হঠাৎ মারা যান। এখন দুটী কন্যা—করুণাময়ী আর মৃন্ময়ী। দুজনেরই বড় ঘরে বিবাহ হইয়াছে—তাঁদের জন্য শ্যামা দেবীকে কোন ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হয় না। এক দুঃখ, বড় মেয়ে করুণাময়ী মা-দুর্গার চেয়েও দুর্লভদর্শনা! শিশু-সন্তানদের লইয়া মায়ের কাছে আসা তাঁর ঘটিয়া উঠে না। কালীঘাটে মানত-পূজা দেওয়ার আবেদন জানাইয়া ক'দিনের ছুটি মঞ্জুর করাইয়া এবারে তিনি আসিয়াছিলেন।

চলন্ত ট্রেণে বসিয়া অনিন্দিতা রেল-লাইনের দু'ধারের বিচিত্র দৃশ্য দেখিতেছিল। পশ্চিমের রুক্ষ শুষ্ক পথ-ঘাটের তুলনায় সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির স্নিগ্ধ রূপ সে যেন দু'চোখ ভরিয়া পান করিতেছিল। চষা মাঠে ফসলের অঙ্কুর দেখা দিয়াছে—ইতস্ততঃ ঘন বাঁশঝাড়ের ফাঁকে ফাঁকে গ্রাম দেখা যায়—কত পুষ্করিণী—পানায় ভরা। পুষ্করিণীর বুকের কহ্লারের অপূর্ব্ব শোভা! লাইনের কাছে কাছে মাঝে মাঝে দেখা যায় গোল-পাতার আচ্ছাদনে নিকানো মাজা কুটীর—অনিন্দিতার মুগ্ধ-নয়নে ওগুলা যেন স্বপ্নের পুরী! সকালের স্নিগ্ধ রৌদ্রকিরণে আঙিনায় বসিয়া, নারিকেল-কুঞ্জে বসিয়া গ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বেতের ধামাতে মুড়ি-মুড়কি খাইতেছে—অর্দ্ধনগ্ন ছেলেমেয়েরা রেলগাড়ী দেখিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছে! পুষ্করিণীতে তালগাছ-

ফেলা ঘাট—সেই ঘাটে বসিয়া ঘোমটায় মুখ-ঢাকা বালিকা বৌ কোথাও বাসন মাজিতেছে—কোথাও পুষ্করিণীর জলে দু-চারটী মেয়ে কাঁখালে কাপড় জড়াইয়া হাত-পা ছুড়িয়া সাঁতার কাটিতেছে,—কোথাও কিশোরীরা দল বাঁধিয়া জলে গা ডুবাইয়া স্নান করিতেছে, কাপড় কাচিতেছে। এমন বিচিত্র দৃশ্য অনিন্দিতা এই নূতন দেখিল। কোথাও কালকাসিন্দার ঘন ঝোপ—বনের কটু গন্ধ ট্রেণের কামরার মধ্যে ভাসিয়া আসিতেছে—কোথাও একটা শিমূল-ফুলের গাছ,—শিমূলের ফল পাকিয়া ফাটিয়া হু-হু বাতাসে সূক্ষ্ম তুলার আঁশ ভাসিয়া আসিয়া অনিন্দিতার নাকের ডগায় জড়াইয়া গেল। সলজ্জ হাস্যে হাত দিয়া সেটুকু সে সরাইয়া ফেলিয়া দিল। চোখ তুলিতেই দেখে, এক-সার পলাশ-ফুলের গাছে যেন সকাল-বেলাতেই সূর্য্যাস্তের গোধুলি-বর্ণ বিচ্ছুরিত! কি চমৎকার লাল রং! ঠিক লাল নয়—শরৎকালের পশ্চিম আকাশে অপরাহ্ণবেলায় যে রং ফোটে, সেই রং—এ রঙের কি নাম, অনিন্দিতা জানে না!

ট্রেণ ক্রমে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী হইল। কি বিরাট সব কল-কারখানা! বড় বড় অফিস! হাওড়া ষ্টেশন, হাওড়ার পুল, পথে জনারণ্য—এখানে সকলই যেন অদ্ভুত! রূপকথার দৈত্য, না, রামায়ণের ময়দানব যেন এত বড় বড় ঘর-বাড়ী পথ তৈয়ারী করিয়া গিয়াছে! কলিকাতা তখন ভারতবর্ষের রাজধানী, অনিন্দিতা জানে—তাই বলিয়া সে রাজধানী এত বড় এবং রাজ-ধানীতে এত ঐশ্বর্য্য, এ ধারণা তার ছিল না। ঘোড়ায় টানা বড় বড় গাড়ী লাইন ধরিয়া চলিয়াছে—এ নাকি ট্রাম-গাড়ী। তাছাড়া চেরিয়ট, ব্রুহাম, ল্যাণ্ডো, ফিটন কত নামের কত ছাঁচের গাড়ী—সংখ্যা হয় না। টক-টক শব্দে ঝক্‌ঝকে সাজ-পরা ঘোড়া-গুলো যেন বাতাসের মুখে উড়িয়া চলিয়াছে! আর সে-সব

গাড়ীর চাকায় শব্দ নাই। সুলতার শ্বশুরবাড়ীর ল্যাণ্ডো—এদের কাছে কোথায় লাগে? রাস্তার দু-ধারে কত রকমের জিনিষপত্রের সাজানো দোকান। তৈরী জামা, ছেলেদের স্যুট, মেয়েদের রকমারী শাড়ী দড়িতে ঝোলানো—দেখিয়া মন প্রলুব্ধ হয়—চোখ ফেরানো যায় না। কত বিচিত্র রব তুলিয়া ফেরিওয়ালার দল পথ সরগরম করিয়া চলিয়াছে। কেহ বলিতেছে, "চাই অবাক জলপান।" কাহারও বুলি—"সাড়ে বত্রিশ ভাজা", কেহ ছড়া কাটিয়া বলিতেছে—

"অবাক্ কস্তর, মীন, পয়সায় রকম তিন
খেতে মজা, দেখতে মজা, শুনতে মজা।"

একটি মাত্র পয়সা দিয়া তিনটি মজা উপভোগ করিবার লোভ অনিন্দিতাকে দমন করিতে হইল। সে যে-বাড়ীর মেয়ে, পয়সা চাহিয়া ফেরিওয়ালার খাবার কেনা, সে-বাড়ীর নিয়মে নাই—কেনা অপরাধ। তাই মনের আগ্রহ মনে চাপিয়া রাখিতে হইল।

করুণাময়ীর সময় বড় কম। শ্যামবাজারে জ্যাঠা মহাশয়কে দেখিয়া পিসিমাকে প্রণাম করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে মায়ের কাছে চলিলেন। রাত্রে পথে গ্যাসের আলো জ্বলিতেছে—অনিন্দিতা বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া চাহিয়া দেখিতেছে। মামার বাড়ীতে প্রায় সমবয়সী মামী তার এ বিস্ময় বুঝিয়া হাসিয়া সারা। জলের কল খুলিতে গিয়া সে যখন ঝাঁজরী কলের ট্যাপ্ খুলিয়া ভিজিয়া গেল—তখন "ও বড়দি! তোমার মেয়েকে জংলি করেই রেখেছ!" বলিয়া মামী তার মাকেও হাসাইল।

কালীঘাটে গিয়া পূজা দেওয়া হইল, তারপর আলিপুরের

চিড়িয়াখানা—মিউজিয়ম, সার্কাস দেখা হইল। ক্রমে বাড়ী ফিরিবার দিন আসিল। কিন্তু এখানে সেখানে দেখার আশা মিটিল না। মা দিদিমারা ইহারই মধ্যে এক-রাত্রি থিয়েটার দেখিতে গেলেন, অনিন্দিতাকে লইয়া গেলেন না। দাদু জানিলে রাগ করিবেন! ও-বাড়ীতে ছোটদের এ-সব বারণ। সার্কাস দেখায় আপত্তি নাই। ঐ পর্য্যন্ত। অনিন্দিতা বন্ধু-বান্ধবের মুখে থিয়েটারের কত আলোচনাই শুনিয়াছে—দেখার সাধ প্রবল—কিন্তু এ সাধ মিটিবার উপায় নাই। নিষিদ্ধ বিষয়ে অযথা লোভ করা নিষ্ফল—তাহা সে জানে। অভিমানে দুঃখে চোখে হয়তো কখনো জল আসিয়া পড়ে, কিন্তু মুখে আব্দার তুলিতে পারে না। শুষ্ক স্বরে মার কাছে গিয়া শুধু বলিল, "তুমি ফিরে এসে গল্প বলো মা।"

করুণাময়ীর ইচ্ছা ছিল, মেয়েকে সঙ্গে লইয়া যান, কিন্তু সাহস হয় না! তিনি বলিলেন, "ও গল্প তো তুই জানিস্, সীতার বনবাস।"

অনিন্দিতার মুখখানা কি-রকম হইয়া গেল—বুকটা ধক্‌ধক্ করিয়া উঠিল। সীতার বনবাস! সে দেখিতে পাইবে না! সেই সুন্দর গানটা "চমকে চপলা চমকে প্রাণ, চাহ মা চপলাহাসিনী!"

মুখ নীচু করিয়া পায়ের আঙুল দিয়া মেজে ঘষিতে ঘষিতে আবেগ দমন করিয়া সে বলিল, "তবু বলো মা, কি রকম কি হলো।" বলিয়াই দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

তারপর বাড়ী ফিরিয়া আবার সেই চিরদিনের রুটীনে বাঁধা জীবন। ভোরে ঘুম ভাঙ্গিয়া ওঠা হইতে রাত্রে বিছানায় শোয়া পর্য্যন্ত সেই একই ধারা। পড়াশুনা, খাওয়া-দাওয়া, খেলা—

সাংসারিক জীবনের খুঁটিনাটি শিক্ষা, সব একেবারে নিয়ম মানিয়া চলা।

কিন্তু হঠাৎ জীবনের গতি বদলাইয়া গেল! বি-এ ক্লাশের একটি ছেলেকে চোখে দেখিয়া জ্যাঠা মহাশয়ের ভারী পছন্দ হইল। কলেজের প্রিন্সিপ্যাল এঁদের বন্ধু—ছাত্রের বিশেষ সুখ্যাতি করিলেন; বলিলেন, "এ ছেলে পড়ে থাকবার নয়—জীবনে উন্নতি করবেই।" বেশ সুশ্রী চেহারা, বয়স কম। ছেলেটিকে তিনি জামাই করিবেন ঠিক করিয়াই আসিলেন!

দাদুর একটুও ইচ্ছা ছিল না। অনিন্দিতার বয়স কম, তার এমন বুদ্ধি, পড়াশুনা করিতেছে ভালো, শরীর খুব সুস্থ নয়, ইহার মধ্যে বিবাহ!

দাদু প্রবল ভাবে মাথা নাড়িলেন। ইহার উপর আর কাহারও কথা চলে না।

কিন্তু মেয়েলি শাস্ত্রে বলে, 'বিয়ের ফুল ফোটা'! হাইকোর্টের রায় বাহির হইবার পরেও ব্যারিষ্টারের যুক্তি-প্রয়োগ বন্ধ হইল না। জ্যাঠা মহাশয় একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—ভয়ে ভয়েই বলিলেন, "ছেলেটি কিন্তু বড় ভালো!"

দাদু অনিন্দিতাকে তার নিত্যকার সংস্কৃত পাঠ দিতে ছিলেন।

জ্যাঠা মহাশয়ও উঠিয়া যান নাই—পড়া শেষ হইলে অনিন্দিতা বই-খাতা গুছাইয়া উঠিবার উদ্যোগ করিতেছে, হঠাৎ শুনিল, জ্যাঠা মহাশয় সসঙ্কোচে বলিতেছেন, "ছেলে অবশ্য ভালো পাওয়া যাবে, কিন্তু ভালো ছেলের এমন ভালো চেহারা—সহজে মেলে না।" সুদেষ্ণার বর তেমন গৌরবর্ণ হয় নাই বলিয়াই হয়তো এ কথা তাঁর মনে হইয়াছিল।

জ্যাঠা মহাশয়ের উপর অনিন্দিতা মনে মনে বিষম চটিয়া উঠিলেও নিরুপায়ে তাড়াতাড়ি পত্ত-অনুবাদের খাতা টানিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তার মনে একান্ত ভরসা, দাত্ব কখনো এ আবদার শুনিবেন না। কিন্তু চলিতে গিয়া সহসা শুনিল, দাত্ব বলিতেছেন, "তোমার যখন এত পছন্দ হয়েছে, দাও না হয় বিয়ে।"

অনিন্দিতার পা কেমন কাঁপিয়া উঠিল—পড়িয়া যাইতেছিল—কাছে চেয়ার ছিল, তার একটা হাতল সবলে চাপিয়া ধরিল। নির্ব্বাক অসহায় দৃষ্টিতে নির্নিমেষ চক্ষে সে চাহিয়া রহিল।

জ্যাঠা মহাশয় আর কি বলিলেন—পিতা-পুত্রে এ সম্বন্ধে আর কোনো কথা হইল কিনা—অনিন্দিতা জানে না। জ্যাঠা মহাশয় কখন এ-ঘর হইতে চলিয়া গিয়াছেন—দাত্ব আসিয়া কখন তার কাছে দাঁড়াইয়াছেন—অনিন্দিতার খেয়াল নাই।

দাত্ব আসিয়া স্নেহ-মধুর কণ্ঠে ডাকিলেন, "সরস্বতী!"

দাত্ব এখন তাকে সরস্বতী বলিয়া ডাকেন।

দাত্বর এ আদরের ডাকে অনিন্দিতা সান্ত্বনা পাইল না—কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল! তার কণ্ঠ শুকাইয়া উঠিয়াছে—কে যেন কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়াছে! কণ্ঠে স্বর ফুটিবে কি করিয়া?

দাত্ব অবস্থা বুঝিলেন—হাতের বই ক'খানা টানিয়া সামনের টেবিলে রাখিয়া দিলেন—তারপর নিজের চেয়ারে বসিয়া তাহাকে নিজের কাছে টানিয়া লইলেন। এতক্ষণে চোখের জল দুই কপোল বহিয়া নামিল। সঙ্গে সঙ্গে সে যেন একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়া দাত্বর কোলের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া দু'হাতে মুখ ঢাকিল। অশ্রু অজস্রধারে উৎসারিত হইতে থাকিল। মনে হইল, জীবনে এত বড় আঘাত সে আর কখনও পায় নাই।

অনিন্দিতার অবিন্যস্ত কেশরাশির মধ্যে দাত্ব অঙ্গুলি চালনা

করিতেছিলেন। তার কান্নার ব্যাঘাত না ঘটাইয়া শান্তভাবে ভাবপ্রবণ মেয়েটির প্রথম আবেগটুকু প্রশমিত হইবার অবসর দিলেন। ছাপাখানা হইতে তাঁর বইএর গেলি-প্রুফ লইয়া লোক আসিলে নীরবে হাত তুলিয়া তাহাকে ঘরে ঢুকিতে নিষেধ জানাইলেন। সে একটু হতচকিত ভাবে চকিতের জন্য অনিন্দিতার দিকে চাহিয়াই ত্রস্তে সরিয়া গেল।

সান্ত্বনার কথার চেয়ে অনেক সময় সহানুভূতির গভীর স্পর্শে বেশী সান্ত্বনা পাওয়া যায়! অনিন্দিতার মনের প্রথম ধাক্কা কাটিয়া আসিতেছে, অনুভব করিয়া দাদু কহিলেন, "উঠে বসো সরস্বতি! তোমার দিদির বাহনেরা আনাচে-কানাচে ঘোরাঘুরি করছে—এরপর তোমাকে ওরা ক্ষ্যাপাবে।"

অনিন্দিতা ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া উঠিয়া বসিল। চোখে আবার অশ্রুর ঝর্ণা! সে একেবারে কাঁদিয়া সারা।

দাদু তার চোখের জল মুছাইয়া দিতে দিতে স্নেহ-করুণ কণ্ঠে বলিলেন, "অত কাঁদিসনে দিদি, বিয়ে ওরা দেবে বলছে—দেয়ই যদি, চৌদ্দ বছর বয়স পূর্ণ না হলে আমি তোকে শ্বশুর-ঘর করতে পাঠাবো না। ভয় কি!"

এতক্ষণে অনিন্দিতার মুখে কথা ফুটিল। ধীরে ধীরে সে বলিল, "আমায় যে ঋষিকন্যাদের মত চিরকুমারী রাখবেন বলেছিলেন, কেন তা' রাখবেন না? আমি তা' হতে পারি না?"

যে অনুযোগ সে করিল, বিচারকের কাছে তাঁর নিজের বিরুদ্ধে এ যেন বিচার-প্রার্থনা! অপরের কাছে এর কোনো অর্থ হয়তো ছিল না, কিন্তু যার উদ্দেশে করা হইল, তাঁর কাছে ইহার অর্থ খুব গভীর। অনিন্দিতার অজ্ঞাতে দেওয়া এ-আঘাত তাঁহাকে বাজিল। আত্মসম্বরণ করিতে সময় লাগিল। তারপর ধীর কণ্ঠে তিনি

কহিলেন, "তুমি ঠিক বলেছো অনিন্দিতা! তোমায় আমি যে শিক্ষা দিয়ে এসেছি, তার মধ্যে এ-সব রহস্য-আলোচনার স্থান ছিল না। তোমার মন বুঝে আমি একসময়ে তাই ঠিক করেছিলুম, কিন্তু নিজের সঙ্গে তোমার বয়সের এতখানি পার্থক্য বলেই ভরসা পাইনি। কৌমার-ব্রত—সব চেয়ে কঠিন ব্রত। এ ব্রত পালন করে মানুষ মৃত্যুকে ইচ্ছাধীন করতে পারে—এ কি সহজ ব্রত? আমি যদি কাল মরে যাই, তোমাকে এ-পথে কে চালাবে দিদি? তাই অনেক ভেবেই সে ইচ্ছা ত্যাগ করেছি—তুমিও তাই করো।"

যে কথা দাদুর মুখে উচ্চারিত হইল, তাহার উপর কোন যুক্তি, তর্ক চলে না। সুদূরপ্রসারী দৃষ্টির কি পরিচয় এ কথায়—বালিকা হইলেও অনিন্দিতা তাহা বুঝিল। দাদুর মুখের দিকে সে চাহিল—চাহিতে দেখিল, তাঁর সৌম্য সুন্দর মুখে যেন বেদনার ছায়া! নিজেকে প্রাণপণে সংযত করিবার জন্য সে চেষ্টা করিতে লাগিল; এবং নিজের অপরাধ-স্খালনের উদ্দেশে কিছু বলিবে বলিয়া কথা খুঁজিল—কিন্তু তার মুখে ভাষা ফুটিল না।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

এক একটা ঘটনা এমন অতর্কিতে ঘটিয়া যায় যে, ভালো করিয়া তাহা বুঝিয়া লইবার অবসর মেলে না। অনিন্দিতার বিবাহ-ব্যাপারে সেই রকম ঘটিল। বাড়ীর ঘটক সুদেষ্ণার সহিত এ-পাত্রটির বিবাহের সম্বন্ধ লইয়া আসিয়াছিল—কিন্তু কোষ্ঠীর বিচারে গরমিল হওয়ায় বাতিল হইয়া যায়। সুদেষ্ণার বিবাহের পর ঘটক একদিন আসিয়া বড়বাবুকে বলে, পাত্রের পিতামহ এ-বাড়ীর সঙ্গে কুটুম্বিতা করিতে চান—ছোটবাবুর মেয়েটির সঙ্গে তাঁর পৌত্রের বিবাহ দিতে ইচ্ছুক—কোষ্ঠীর নকল ঘটকের নিকট হইতে লইয়া মিলাইয়াছেন—কোষ্ঠী মেলে। মেয়ে দেখিবেন না—একেবারে পাকা দেখা করিয়া দিন স্থির করিতে চান। বড়বাবু স্বচক্ষে পাত্র দেখিয়াছেন, খোঁজ-খবরও সেবার লওয়া হইয়াছে।

এক কথায় 'লাখ কথার' কাজ সারা হইয়া গেল। ভালো দিন-ক্ষণ দেখিয়া লক্ষ্মীনাথবাবু পাত্রী আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন। দাদুর চোখ সহসা ঈষৎ আর্দ্র হইয়া আসিল। একটা উদ্যত নিশ্বাস সযত্নে চাপিয়া তিনি যখন কথা কহিলেন, তখন স্বরে ঈষৎ চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইল। পূর্ব্বে লক্ষ্মীনাথবাবু মেয়ের সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছিলেন, "একটু রোগা—তা ছাড়া আর তো কোনো দোষ নেই।"

এ-কথার উত্তরে দাদু বলিলেন, "তাই তো ওকে পরের ঘরে পাঠাতে আমার ভাবনা হয়!—কিন্তু আপনি এত স্নেহ-আদর করে ওকে নিয়ে যেতে চাইছেন—ওর সৌভাগ্য! আমিও ওর সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকতে পারবো এখন।"

করুণাময়ীর কাছে বড়-ঘরের দু-একজন লোক অনিন্দিতাকে যাচিয়া বধূ করিতে চাহিয়াছিল; কিন্তু গুরুজনের কাজে প্রতিবাদ

করা স্বভাব নয়। তাই তিনি নিজের ইচ্ছা মনেই চাপিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু শ্বশুর যখন তাঁহাকে অপরের অসাক্ষাতে এ বিবাহ-সম্বন্ধে মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন তিনি সে-কথা না জানাইয়া থাকিতে পারিলেন না। শুনিয়া দাদু একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "তুমি তো জানো ছোটমা, আমি জমিদার-বাড়ীকে বড় ভয় করি। আমাদের দেশের জমিদার-ঘরের ছেলে—দু-একজন ক্বচিৎ যদি মানুষ হয়! আমার সরস্বতীকে মূর্খের হাতে দিতে পারবো না! ও-ছেলে তো এণ্ট্রেন্স্ পাশ, যদি আর না উঠতে পারে! এর বিদ্যে ওর চেয়ে এখনই ঢের বেশী!"

করুণাময়ী মৃদু কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "না বাবা, আপনি ওর জন্য যা' ভালো মনে করবেন, তাই হবে!"

দাদুর কাছে সেদিনের সে সান্ত্বনা পাইবার পর হইতে অনিন্দিতা যদিও শান্ত হইয়াছিল, তবু এ-বিবাহ ব্যাপারটাকে বেশ খুশী মনে সে গ্রহণ করিতে পারে নাই। নূতন অলঙ্কার বস্ত্র প্রসাধন, সকলের কাছ হইতে উপহার, এ-সব তাহার বালিকা-চিত্তকে মাঝে-মাঝে একটু উল্লসিত করিতে থাকিলেও এ-সকল পাওয়া কেন, সে-কথা মনে হইলেই তার দুচোখে জল ছাপাইয়া আসে। একা থাকিলে বিছানায় পড়িয়া মুখ গুঁজিয়া সে কাঁদে। কখনও ছোট ছোট ভাই দুটিকে খুব বেশী আদর করিয়া কাছে ডাকে, তাদের সঙ্গে খেলিতে বসে। হঠাৎ অত্যন্ত আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া অনেক কষ্টে অশ্রুর উৎস ঝরিতে দেয় না।

সুলতা শ্বশুরবাড়ী হইতে আসিয়া দুহাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। আর রক্ষা আছে! যত সে তাহাকে বুঝাইতে থাকে, ততই তার কান্না বাড়ে। সুলতারও চোখ শুষ্ক থাকে না। তবু সে

হাসিবার চেষ্টা করে। ধমক দিয়া বলে, "পান্‌সে-চোখি—থাম্‌! এই তো সুদেষ্ণার বিয়ে হলো, সে কেঁদেছিল? বিয়ে যেন কারো কখনো হয়নি! শুধু তোর একার হচ্ছে!"

অনিন্দিতা রাগ করিয়া তির্‌মির্‌ করিয়া সুলতার হাত ছাড়াইয়া লইল; রাগ করিয়া মুখ-ঝাম্‌টা দিয়া বলিল, "জানিগো জানি, তুমি তো এখন ওই সব বলবে। বিয়ে হলে তো তোমার মতন হবো— তাই তো আমার ভয়।"

সুলতা হাসিয়াই মুখ ঈষৎ ভার করিল—বলিল, "আমি বিয়ে করে কি দোষ করেছি শুনি, যার জন্যে তোর বিয়েয় বিতৃষ্ণা?"

অনিন্দিতা একটু গুম হইয়া থাকিয়া, পরে বলিল, "হবে না! তুমি কি এখন আর আমার আগের সেই দিদি আছো? তুমি আমার চেয়ে সুনীলবাবুকেই এখন বেশী ভালোবাসো। তুমি বলতে পারো, বাসো না?"

লজ্জায় সুলতা লাল হইয়া উঠিল! কিন্তু নিজের সে সলজ্জ ভাব গোপন করিয়া হাসিমুখে স্নেহের সুরে বলিল, "তোর মাথা! তা কখনও হয়?"

তীক্ষ্ণ নেত্রে দিদির মুখের দিকে চাহিয়া অনিন্দিতা কহিল, "হয় না, বল্‌ছো? আমি জানি, খুব হয়! তুমি তাই বাসো। বিয়ে করলে মানুষ এমনি অপদার্থ হয়ে যায়। বাড়ীশুদ্ধুর তা হবার দরকার কি!"

সুলতা হাসিয়া ফেলিল—"হিংসুকি!" তারপর তার মাথাটা বুকে টানিয়া গভীর স্নেহ-স্বরে কহিল, "আশীর্ব্বাদ করছি, তুমিও স্বামীকে প্রাণ ঢেলে যেন ভালোবাসবার সুযোগ পাও! মানুষের বুকের ভিতরটা অনি, এত বড় যে একজনকে ভালোবাসলে আর-কাকেও কেন ভালোবাসতে পারবে না? ভালোবাসার গণ্ডী ছোট নয়, সমুদ্রের

মত তাকে বড় হতে দিও। দেখবে, এত দিন ধরে মনে-প্রাণে যাদের ভালোবেসে এসেছো—তাদের ঠিক তেমনি করেই ভালোবাসবে —আরো অনেককে এমনি ভালোবাসতে পারবে—ভালোবাসার কোথাও কিছু কম পড়বে না।"

দিদির এ-কথা অনিন্দিতা একান্ত-মনে শুনিল। কথাগুলি তাহার চিত্ত স্পর্শ করিল। দাদু এবং দিদি—দু-জনের কথায় অনিন্দিতার আস্থার সীমা নাই! তার সকল শিক্ষার মূল দিদি! ভালো বুঝুক, না বুঝুক—মনে সে ভরসা পাইল। অশান্ত-চিত্ত কতক সুস্থির হইল।

বিবাহের পরের দিন ও-বাড়ীর রীতি-অনুযায়ী কুশণ্ডিকা সারিয়া বাড়ী ফিরিতে বর-বধূর প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল। ও বাড়ীর মেয়েরা যথাসাধ্য সাজসজ্জা শেষ করিয়া জোড়া শাঁখ হাতে এ জানালায় ও জানালায় উঁকি দিয়া ফিরিতেছিল। পথে গাড়ী দেখিলেই, "ওই বউ এলো"—বলিয়া হুড়াহুড়ি করিয়া খিড়কির দিকে ছুটিতেছে—সঙ্গে সঙ্গে শাঁখ বাজিতেছে। আবার ভুল বুঝিয়া হতাশ ভাবে, "বাবারে, বউএর আর আসার বার হয় না" বলিয়া ফিরিতেছিল। বাড়ীর ভিতর-মহলে খুব বড় করিয়া 'বৌ-ছত্র' আঁকা হইয়াছে। পদ্ম-পাতার ভিতরে-ভিতরে লেখা "স্বাগতম্"—দুধে-আলতার পাথর, জীবন্ত ল্যাটা মাছ, ধানের কেটো, মঙ্গল খই প্রভৃতি যথাস্থানে সাজাইয়া শাশুড়ী-স্থানীয়ারা পট্টবস্ত্রে অষ্টালঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া বধূ-বরণের প্রতীক্ষায় আছেন। সকলের প্রসন্ন মুখ—উৎসুক দৃষ্টি—কম-বয়সীদের মধ্যে ভীষণ অধৈর্য্য।

বর-বধূর গাড়ী আসিল। বাড়ীতে ছুটাছুটি পড়িয়া গেল।

বর-কন্যা বিদায়ের একটু পূর্ব্বে অনিন্দিতা যখন সিন্দুর-রঞ্জিত-সীমন্তে

নববধূর বেশ ধারণ করিতেছিল—করুণাময়ীর কাছে ললাটে চন্দনের পত্র-লেখা রচনার ভার লইয়া সুদেষ্ণা সহাস্যে কাছে আসিল। সারা-দিন লোকের ভিড়ে অনিন্দিতাকে সে একলা পায় নাই! কুশণ্ডিকার খুঁটিনাটি 'নিত্-কিত্', তারপর অনিন্দিতার বিবাহে দাদু তার নামে যে সংস্কৃত শ্লোক ছাপাইয়া একশত-আটজন বড় বড় পণ্ডিত-বিদায়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—সেখানে উপস্থিত থাকিয়া বর-বধূর আশীর্ব্বাদ-গ্রহণ—এই সব কাজে দিন কাটিয়া গিয়াছিল। অথচ তার সঙ্গে সুদেষ্ণার মনের একটা কথা বিনিময় নিতান্ত প্রয়োজন।

পড়াশুনায় অনিন্দিতা যেমন দাদুর প্রিয়-শিষ্যা, সুদেষ্ণা তেমনই শিল্পকলায় করুণাময়ীর প্রিয়-পাত্রী। সূক্ষ্ম শিল্পে এই বয়সেই সে হাত বেশ পাকাইয়া ফেলিয়াছে। চন্দনের পত্র-লেখা রেখায় ও বিন্দুতে—সুদেষ্ণার এ-রচনা খুব চমৎকার হইতেছে দেখিয়া করুণাময়ী কার্য্যান্তরে গেলেন।

সুদেষ্ণার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল! হাতের কাজ চালাইয়া যাইতে যাইতে সে তখন মৃদুস্বরে অনিন্দিতাকে বলিল, "কিরে অনি, বর কেমন হলো?"

অনিন্দিতা এক-ঝটকায় মুখ ফিরাইয়া সবেগে জবাব দিল, "জানিনে, যাঃও!"

"আঃ! কি করলি—গেল সব মাটি হয়ে!" সুদেষ্ণা দু-একটা চন্দনচিত্র অঙ্গুলি দিয়া মুছিয়া ফিরিয়া নূতন চিত্র রচনা করিতে বসিল। চুপি চুপি আবার জিজ্ঞাসা করিল, "আহা, বল না ভাই, শুনতে কি সাধ যায় না?"

এবার গম্ভীরমুখে অনিন্দিতা কহিল, "আমি দেখিনি।"

"ইস্, তাই নাকি!" অবিশ্বাসে সুদেষ্ণা মুখ বিকৃত করিল "বললেই আমি শুন্‌ছি কিনা! দেখেননি, না, কচু!"

অনিন্দিতা ভারী-মুখে উত্তর দিল, "আমার তো আর খেয়ে-দেয়ে ঘুম হয় না, তাই কোথাকার কে এলো, তাকে অম্‌নি দেখতে ছুটবো! তুই বুঝি দেখেছিলি?"

সুদেষ্ণা হাসিয়া ফেলিল, "ওমা তা দেখিনি আবার! নাহলে শুভদৃষ্টি হবে কি করে? তুই শুভদৃষ্টি করিস্ নি—সত্যি?"

অনিন্দিতা প্রবলবেগে ঘাড় নাড়িল।

"ওমা, শুভদৃষ্টি করলিনি কি বলে? ও যে করতেই হয়। না-হলে বর ভালোবাসবে কেন?"

অনিন্দিতা ডান-হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া সগর্ব্বে কহিল, "বয়ে গেল!"

"বয়ে যাওয়া নয়, তখন মজা দেখবে? তোর মতন হনুমান আর দুটি নেই!" বাঁদর কথাটাই সে সর্ব্বদা ব্যবহার করে, তবে আজ নাকি শুভদিন, অশুভঙ্কর অত বড় কথাটা আজ মুখে আনিল না। তার বদলে শ্রীরামচন্দ্রের বাহন হিসাবে সম্মানিত হনুমানের নাম বলিল।

অনিন্দিতা আর একবার ঝট্‌কা দিয়া মুখ সরাইয়া ভ্রূকুটিভঙ্গে সুদেষ্ণার দিকে চাহিল। রাগ করিয়া বলিল, "হনুমান ছেড়ে বাঁদরও হতে পারি, তা বলে তোমার মতন বেহায়া নই!"

যাত্রার সময় আসন্ন। বাহির হইতে তাগিদ আসিল। সুলতা আসিয়া কপালের উপর সিঁতি-পাটি পরাইয়া সাজ সম্পূর্ণ করিয়া দিল। অনিন্দিতার দু-চোখ সজল দেখিয়া নিজের অশ্রু সম্বরণ করিতে তাড়াতাড়ি ভিড়ের পিছনে সরিয়া দাঁড়াইল। সে জানে, তার চোখের জলের আভাস দেখিলে অনিন্দিতা ভয়ানক কাঁদিবে।

বড় আদরের অনিন্দিতাকে অপরিচিত পরের হাতে সঁপিয়া দিবার সময় দাদুর মত পুরুষেরও হাত কাঁপিয়াছিল। প্রকাণ্ড

দালানে তাঁর গম্ভীর কণ্ঠস্বর কিছুক্ষণ যেন স্পন্দিত হইতে লাগিল। উপস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তির কাণে সে কথাগুলো ভীম-গম্ভীর রোলে বাজিয়াছিল, "আমার বড় আদরের ধনকে আজ আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদের সঙ্গে তোমায় দিলাম—ভালোবাসায় ওর ত্রুটিবিচ্যুতি ক্ষমা করে তুমি ওকে মনের মত গড়ে নিও। শ্রদ্ধা দিয়ে সম্মান দিয়ে ওকে বড় করে তুলো। তোমাদের দুজনের জীবন সম্পূর্ণ হোক, সার্থক হোক!"

নতমুখী অনিন্দিতার দু-চোখে মুক্তার ঝালর যেন—দেখিয়া দাদুও চোখের জল সম্বরণ করিতে পারিলেন না! সযত্নে অনিন্দিতার চোখের জল মুছাইয়া তিনি বলিলেন, "শুভক্ষণে কাঁদে না দিদি—কাঁদতে নেই!"

শ্বশুরবাড়ী আসিয়া অনিন্দিতা দেখিল, এ-জায়গাকে যতখানি ভয়ঙ্কর ভাবিয়াছিল—জায়গাটা তেমন ভয়ের নয়। বরং অনেক বিষয়ে নিতান্ত অচেনা অজানা এই একান্ত পরের বাড়ীতেও কি যেন এক নূতন অনুভূতি—সেই সঙ্গে কেমন একটু আকর্ষণও যেন সে অনুভব করিল! অপরিচিত মুখ, নানা-আলোচনা, আচার-ব্যবহারও কতক-কতক অন্য ধরণের। তবু কই, তেমন বিরক্তি বোধ হইল না তো! কোনো বিষয়ে সুবিধা-অসুবিধার কথা তার মনে ওঠে না! সকলের সঙ্গে সমান হইয়া মিশিয়া যাইবার শক্তি আর শিক্ষা সে পাইয়াছে; অভ্যস্ত পথ হইতে তাই নিজেকে ফিরাইয়া লইতে তার বাধে না!

আর এক বিষয়ে অনিন্দিতা বেশ খুশী হইল। নিজের বাড়ীতে মেয়েদের মধ্যে সকলের চেয়ে সে ছোট—বাড়ীতে ছোটরা তাকে ডাকে, 'ছোটদিদি'—ইহার বেশী মর্য্যাদা বাড়ীতে কেহ দেয় না; এখানে আসিবামাত্র রাতারাতি এমন পদ-বৃদ্ধি। কেহ কেহ বলে—বৌদি! কেহ ডাকে, মামী! কেহ আদর করিয়া বলেন—নাতবৌ! কেহ

বলেন—বৌমা! ছোট ছোট ছেলেরা দ্বারে দাঁড়াইয়া হাসিমুখে তাহাকে দেখিতেছে। অনিন্দিতা ছেলে ভালোবাসে—ভাই-বোনদের কথা মনে পড়ে, হঠাৎ মুখ ভারী হয়—কণ্ঠে স্বর রুদ্ধ-আবেগে ঠেলিয়া উঠিতে চায়! সে ভাব চাপিয়া সে তাড়াতাড়ি ইসারায় তাদের কাছে ডাকে। তারা ছুটিয়া আড়ালে লুকায়। সেখান হইতে একটু মুখ বাহির করিয়া হাসিয়া বলে, "বৌ টু!" অনিন্দিতার ইচ্ছা করে, ছুটিয়া গিয়া উহাদের ধরিয়া আনে, কোলে করিয়া আদর করে—কথা শোনে—শশাঙ্কর মত নয়, তবু কথাগুলি তেমনি মিষ্ট!

কিন্তু হায়, এখানে সে বন্দিনী বধূ! সে-স্বাধীনতা তার কোথায়? জ্যাঠাইমা বার-বার বলিয়া দিয়াছেন, এখানে আসিয়া এতটুকু চঞ্চলতা নয়। নতুন-ঝিকে সঙ্গে না পাঠাইয়া মতিকে পাঠাইয়াছেন, শুধু এ-বিষয়ে খবরদারী করার জন্য! দিনের মধ্যে সাতাশ বার মতি তাহাকে সেই কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। একটু ব্যতিক্রম দেখিলে বাড়ী ফিরিয়া বড়-মার কাছে লাগাইতে ছাড়িবে না!

এই জন্যই তার বউ-হওয়া ভালো লাগে না। এদের বাড়ী যদি এমনই বেড়াইতে আসিত, বেশ হইত—যেমন দিদির শ্বশুরবাড়ীতে মাঝে মাঝে যায়। সেখানে তার কোনো বাধা-নিষেধ নাই।

ছোট সহর—গ্রাম্য ভাবে ভরা। বড় বড় বাড়ীর অভাব নাই! পথে বড় বড় জুড়িও হৈ-হৈ শব্দে চলিতেছে। কিন্তু সাধারণ ঘরের মেয়ে-বৌয়েরা পায়ে হাঁটিয়া এ-বাড়ী ও-বাড়ী যাতায়াত করেন, গঙ্গাস্নানে যান, বৌ দেখিতে আসারও সময়-অসময় নাই, তার বিরামও নাই! সাত-সকালে আরম্ভ হয়, দেড়-প্রহর রাত্রি অবধি চলে। শুধু এ-পাড়া নয়, অন্য পাড়া হইতেও গিন্নীরা, মেয়েরা, বৌয়েরা বধূ দেখিতে আসে। বধূর চারি পাশে এক-ঝাঁক ছেলে-মেয়ে কিশোরী প্রৌঢ়া বৃদ্ধা সব সময়ে লাগিয়া আছে। সব সময়েই বধূকে

এবং তাহার শ্বশুরবাড়ীর লোকদের এক কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া প্রত্যেকের কাছে জানাইতে হইতেছে—কুটুম্ব-বাড়ী হইতে কি কি জিনিস দিয়াছে—ফুলশয্যা কি রকম আসিবে? গহনাগুলি বর্ষীয়সীরা হাত দিয়া নাড়িয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া যাচাই করিতেছেন, ওজনের আন্দাজ করিয়া তাঁরা কে কবে এই ধরণের জিনিষ এবং ইহার চেয়েও ভারী কি পাইয়াছেন—সবিস্তারে সে ইতিহাস বলিতেছেন। কম-বয়সীরা চোখে দেখিয়া মনে মুখে প্রশংসা করিতেছে। সোনা-বাঁধানো চিরুণি ফুল-কাঁটা এবং গুঁজিকাঠি পরীক্ষা করিতেছেন। নিরেট সোনার দুখানি পাশ-চিরুণি, বাঃ—এমন তো কারো দেখিনি!

"কেন দেখবো না? মেজবাবুর সেজ-মেয়েকে তার শ্বশুররা দেয়নি? তুই যেন থাকিস থাকিস, ন্যাকা হোস!"

"হাতের রতন-চক্রটা কিন্তু চমৎকার! কত ভরি হবে? হ্যাঁরে লীলা, তা' ভরি দশ-বারো হবে না?"

"ভরি দশ-বারো কি ঠান্‌দি, আঠারো ভরির রতনচুর আর ঐ পিনটাই দশ ভরির!"

"তা' হবে মা! ডবল ফুল কিনা, আর কতখানি চওড়া! নাতবৌয়ের হাত ছাপিয়ে পড়েছে!"

"তা' হ্যাঁ গা, শুন্‌ছি বৌমার ঠাকুরদাদা খুব মস্ত বড় লোক, তা' নাতনীকে কি খেতে দিত না পেট ভরে? এত রোগা কেন?"

"তা' ভাই, বৌমার বয়সই বা কি! বিয়ের জল পেয়েছে, এইবারে মোটা হবে।"

"আহা, মুখখানির কি সুন্দর ছাঁদ! খাসা বউ হয়েছে!"

"হ্যাঁ তা' হয়েছে বটে, তবে তোমরা তখন এই দিকেই ঢলে পড়লে একেবারে বড় কুটুমের লোভে। তা' আমার ভাসুরঝির

মেয়ের রং বাপু, যাই বলো—গড়নও এর চাইতে অনেক উঁচুদরের ছিল! সে-মেয়ে একটা রূপসী! একে তা' আর কেউ বলবে না!"

"কেন বলবে না চারু-পিসি? রংটাই না হয় বিমলার এক-পোঁচ ফরসা—এমন মুখছিরি তার? বয়স-কালে দেখো, আমার বৌ কি রকম হয়।"

"বেঁচে থাকি তো দেখবো! তুইও মা, দেখিস। তা' তোদের মনে ধরেছে তো—তাহলেই হলো! আমার নাতির পছন্দ হয়েছে তো?"

"তা হয়েছে বই কি! না হবেই বা কেন? সে তো এখন বালক বললে হয়—পছন্দ-অপছন্দর কি-বা জানে! যা আমরা শেখাবো, তাই শিখবে।"

"তা'তো বটেই—তা'তো বটেই।"

অনিন্দিতা অবাক হইয়া এই সব সাতশো রকম সমালোচনা শোনে—ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকে। মাঝে-মাঝে রকম রকম কথা শুনিয়া হাসি পায়, কিন্তু হাসিবার উপায় নাই—দাঁত দিয়া ঠোঁট চাপিয়া ধরে।

পুরুষ-মহলে শুধু বৌভাতের একটা দিনই তাকে দেখা দিতে হইল। বাপের বাড়ীর এবং আত্মীয়দের বাড়ীর লোকেরা কেহ কেহ আসিয়াছিলেন—অবশ্য পুরুষরাই। কুটুম-বাড়ীতে মেয়েদের নিমন্ত্রণ যাওয়া বিধি নয়! জ্যাঠা মহাশয় যখন একটা মোহর হাতে দিয়া বধূর মুখ দেখিলেন, তখন সে আর না হাসিয়া থাকিতে পারিল না! প্রণাম করিয়া চুম্বন-প্রাপ্তির জন্য মাথা আগাইয়া দিয়া আবদারের সঙ্গে প্রশ্ন করিল, "আমি কবে যাবো?"

অনিন্দিতাকে বুকের কাছে টানিয়া তার মাথায় হাত বুলাইতে

বুলাইতে জ্যাঠা মহাশয় সস্নেহে বলিলেন, "কেন, বেশ তো আছিস—আর কাঁদিস না, শুনলুম।"

অনিন্দিতা রাগিয়া গেল, "ওরা বুঝি বলেছে? বাব্বাঃ, কাঁদবার যো আছে! চব্বিশ-ঘণ্টা সপ্ত-রথী নয়, অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী ঘিরে রেখে দিয়েছে! আমি আর থাকতে পার্‌ছিনে, কিন্তু!"

জ্যাঠা মহাশয় হাসিলেন, হাসিতে হাসিতে অনিন্দিতার মাথাটা ঈষৎ নাড়িয়া দিয়া কহিলেন, "ব্যস্ত হোস্‌ নি—পরশু যাবার ব্যবস্থা হয়েছে। হৃদয় রইল, আরও কারুকে না হয় পাঠাবো, নিয়ে যাবে।"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

সুলতার একটি খোকা হইয়াছে। অনিন্দিতা বাড়ী ফিরিবার পথে খবর পাইল। তাহাকে দেখিবার জন্য তার ত্বর সহিতেছিল না। অথচ আঁতুড়ঘরের দিকে ছুটিয়া যাইবার উপায় এখন নাই। বিপদের কি সীমা আছে? সেই গাঁটছড়া এখনও খোলা হয় নাই। সে নাকি সেই অষ্টমঙ্গলার দিন খোলা হইবে। শ্বশুরবাড়ী হইতে বৌভাতে পাওয়া ট্যারছা প্যাটার্ণের জরির লতাদার বেনারসী শাড়ী পরিয়া আসিয়াছে, কিন্তু জোড়ে-আসা—তাই বরের গায়ের চাদরখানা ও তার বিয়ের বেনারসীতে গাঁটছড়া-বাঁধা—এ মোট তাহাকে বহিয়া বেড়াইতে হইতেছে। বর নিজে বেশ আছেন, সং সাজেন নাই! ফুলশয্যার ঢাকাই জরিদার ধুতি, সিল্কের পাঞ্জাবী, রেশমের কাজ-করা জরি-দেওয়া ভেলভেটের জুতা—সে-সব ঠিক আছে। মাত্র এই জরিদার বেনারসীর চাদরখানা! যত দায় কনের! কেন, বিবাহ সে একা করিয়াছে?

যথারীতি দেখাশুনা সারিয়া শাড়ী-গহনা সমেত, গাঁটছড়া-বাঁধা শাড়ীটাকে ফেলিয়া দিয়া অনিন্দিতা ঊর্দ্ধশ্বাসে দিদির কাছে ছুটিল। তার পায়ের ঘুঙুর-গাঁথা মলের সঙ্গে পাঁয়জোর—গতিবেগে রোল তুলিয়া শ্রোতাদের কানে যেন তালা ধরাইয়া দিবে! শব্দ শুনিয়া জ্যাঠাইমা বিরক্তিতে আত্মগত ভাবে বলিলেন, "ধিঙ্গি মেয়ে মা তুমি, শ্বশুরবাড়ীতে হয়তো এই রকম করে বেড়িয়েছো!"

অনিন্দিতা মুখ ভার করিয়া একটিবার নীরবে তাকাইল, তার পর চলিয়া গেল।

সুলতা চোখ বুজিয়া শুইয়া আছে, হঠাৎ তার কাণে মলের বাজনা

প্রবেশ করিতে চমকিয়া চোখ চাহিল। অনি নিশ্চয়! বিবর্ণ পাণ্ডু মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইল, দ্বারের দিকে চাহিয়া ডাকিল—'আয়।'

অনিন্দিতা খোকার দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "কি সুন্দর হয়েছে, ভাই! মাগো মা, নাকটা যেন গরুড়ের মতন! হ্যাঁ, ঠিক সুনীলবাবুর মত। চোখ কিন্তু তোমার মত হবে। বেশ বড় বড়, না দিদি?"

"কেন, ওঁর চোখ বুঝি কুঁচের মতন?"

"অমনি তোমার গায়ে বিঁধলো! তাই কি আমি বলছি? তবে তোমার চোখ বেশী বড় নয়?"

"ওঁর চোখের বাহার বেশী। শুধু বড় হলেই বুঝি ভালো হয়?"

"কক্‌খনো না! তোমার চোখ বেশী ভালো—খোকার চোখ তোমার মতন হবে! তা হচ্ছে না—বা রে, সব বুঝি বাপের মতন হবে? এ কেমন কথা! মা বুঝি কেউ নয়?"

সুলতা সস্নেহে হাসিল। বোকা বোনের সহিত তর্ক করিয়া লাভ নাই—সে নিজের মত ছাড়িবে না এবং সুলতার ছেলেকে সে পরের বাড়ীর ছেলের মত দেখিতে চায় না—এও তার জিদের কারণ। সুলতা বলিল, "মিহির এসেছে—তাকে আমি দেখতে পেলুম না! সেদিনও ভালো করে দেখাশোনার সুবিধা হয়নি।"

ঠোঁট ফুলাইয়া অনিন্দিতা জবাব দিল, "ভালোই হয়েচে, নাহলে এতক্ষণ সুদেষ্ণাদের মতন সেইখানেই ছুটতে, আর আমি বেচারী এতকাল পরে ফিরে শূন্য-পুরীতে ভেসে বেড়াতুম!"

"এতকাল কিরে? মোটে তো তিন দিন সেখানে ছিলি!"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া অনিন্দিতা বলিল, "তুমি তো তা' বলবেই। আমাকে কি আর আগেকার মত ছাখো? হতো সুনীলবাবু, তিন দিনে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর তিন যুগ কেটে যেতো।"

আঁতুড়ের ঝি আসিয়া বাধা দিল, বলিল, "কর্ত্তা বাবুর আর ডাক্তার বাবুর বারণ আছে দিদিমণিকে কথা কওয়াতে! ছোটদি' ভাই, তুমি বেশী কথা বলো না।"

অনিন্দিতার মুখ ঈষৎ ম্লান হইল; দেখিয়া সুলতার মায়া করিতে লাগিল, কিন্তু সেও এ নিষেধের কথা জানে, এখনই হয়তো রিপোর্ট যাইবে এবং অনিন্দিতা বকুনি খাইবে! তাই সে বলিল, "যা' ভাই—মার কাছে গিয়ে গহনা-কাপড় সব ছেড়ে ফেলগে। ওঁরা তো অনেক গহনা দিয়েছেন! ভালোই দিয়েছেন।"

অনিন্দিতার এতক্ষণে মনে পড়িল, গায়ে তার গহনার রাশি। অবসাদে ক্লান্ত কণ্ঠে সে বলিল, "গহনা দিয়ে তো সকলে আমায় রাজা করেছেন! পরতে পরতে বলে, আমার প্রাণ বেবিয়ে যাবার যো! আর আমি এ-সব পরছি না! শুধু এই চুড়ি কগাছা—ব্যস্! আচ্ছা, আমি চললুম। খোকাকে ছুঁতে দেবে না এখন—কাল কিন্তু একবার ওকে আমি কোলে নেবোই নেবো। জান্‌লে সৈরবী, তখন আর হুকুম চালাতে এসো না—এলে টের পাবে মজা।"

ওদিকে প্রভা, নন্দিনী, লাবণ্য অনেকে মিলিয়া মিহিরকে জল খাওয়াইতে বসিয়াছে। বড় জায়ের অধিকার—করুণাময়ী বধূর মত থাকেন—দ্বারের আড়াল হইতে জামাইকে একবার দেখিয়া গেলেন। জ্যাঠাইমা আসিয়া বলিলেন, "কিরে, তোরা খাবার-দাবারে কিছু ভেল-টেল দিসনি তো? ঠিক করে বল, তাহলে আমি না হয় চলে যাই।"

সুনীতি তাড়াতাড়ি বলিল, "তা বাপু, তুমি চলেই যাওনা কেন! ভেল না হয় নাই দিয়েছি, তা বলে তোমার জামাই খোকা নয় যে, তোমাকে না দেখলে ভেবরে উঠবে! তুমি যাও।"

মুখ টিপিয়া হাসিয়া তিনি কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন।

রাত্রে মিহিরের খাবার ব্যবস্থা হইয়াছে দাদুর ঘরের ঠিক পাশের ঘরে। সন্ধ্যার পর সুদেষ্ণা দুজনের দেখা করাইয়া দিয়াছিল—দ্বারের পিছনে আড়ি পাতিতেও কসুর করে নাই। সজ্জিতা অনিন্দিতা দ্বারের এপাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। কখন বাহির হইবে, ভাবিয়া বিরক্ত হইয়া অস্থির হইতেছিল। আর মিহির বসিয়া বসিয়া থার্ড ক্লাশের পাঠ্য একটা কবিতা-সংগ্রহের বই কুড়াইয়া তাহার পাতাগুলো এলোমেলো ভাবে উল্টাইয়া দেখিতেছিল।

তারই একটা পাতায় লেখা দেখিয়া মনে মনে আবৃত্তি করিল—

"কেন পান্থ, ক্ষান্ত হও হেরে দীর্ঘ পথ ?
উদ্যম-বিহনে কার পুরে মনোরথ ?
কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে ?
দুঃখ বিনা সুখ লাভ কে করে মহীতে ?"

তার অধর-প্রান্তে হাসির রেখা ফুটিল। অপাঙ্গে সে একবার অনিন্দিতাকে দেখিয়া লইল। সে যে বিরক্ত হইয়াছে, তাহা বুঝিল।

আহারের আয়োজন প্রস্তুত—খবর আসিতেই মিহির উঠিয়া পড়িল, অনতিদূরে কাঠের পুতুলের মত অনিন্দিতা দাঁড়াইয়া আছে, তার পাশ দিয়া যাইতে যাইতে মৃদু হাস্যে বলিল, "পড়া বলতে না পারলে দাদু বুঝি দাঁড় করিয়ে দেন ? বেশ অভ্যাস আছে, দেখছি !"

ঐ রে ! হয়েছে ! এঁরও দেখি, সুনীলবাবুর মত খুনসুটী করা রোগ ! একা রামে রক্ষা ছিল না, আবার তার মিতা ! অনিন্দিতার হাসি পাইল, কিন্তু রাগ হইল বেশী।

ভাগ্যে আজ সুনীলবাবু আসিতে পারেন নাই ! কিন্তু না, আহা, তিনি রোগে পড়িয়া কষ্ট পাইতেছেন ! কি যে ভাবে অনিন্দিতা ! খোকাকে এখনও বেচারী চোখে দেখিতে পান নাই ! না হয়

অনিন্দিতাকে ক্ষেপাইতেন তাহাতে কি এমন ক্ষতি হইত! সে ভারী স্বার্থপর, তাই খপ্ করিয়া এমন কথা ভাবিয়া বসিল। সুনীলবাবুকে খুব শীঘ্র ভালো করিয়া দাও, ঠাকুর!

পরের দিন মিহির চলিয়া গেল। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া অনিন্দিতা খানিকটা ছুটিয়া বেড়াইল। তারপর মৃদুগুঞ্জনে,—"কত কাল পরে, বল ভারত রে, দুঃখ-সাগর সাঁতারি পার হবে?" লাইনটি গাহিতে গাহিতে উৎফুল্ল মুখে খুশী মনে সুলতার ঘরের দিকে চলিল। সে জানে, জ্যাঠাইমা, দাদু বা ডাক্তারবাবুর এখন সেদিকে আসার সম্ভাবনা নাই। দরজায় মৃদু শব্দ হইতেই সুলতা ক্লান্তি-ভারাতুর দু-চোখ মেলিয়া চাহিল। অনিন্দিতা আসিয়াছে, সে তাহা বুঝিতে পারে নাই! এত সাবধানে পা টিপিয়া এমন নিঃশব্দে অনিন্দিতা কবে চলিতে শিখিল? সুলতার সহসা সেই কবিতার ছন্দ মনে পড়িল, কৈশোর-যৌবন দুহুঁ মিলি গেল!

মৃদু কণ্ঠে সুলতা কহিল, "আয়!"

মনে-মনে অনিন্দিতাকে সে কামনা করিতেছিল এবং তার প্রতীক্ষাও করিতেছিল। সে জানিত, এ-সময় আর কেহ এদিকে আসিবে না। তাই অনিন্দিতা এ-সুযোগ কখনও হারাইবে না।

"খোকাটা কি চব্বিশ ঘণ্টাই ঘুমোয়, দিদি? একবারটিও চোখ চেয়ে থাকে না? ওকে তুলি? সৈরবী কোথা? আমি তুলতে পারবো'খন। তুলি, কেমন?"

সুলতা একটু কুণ্ঠিত হইল। পরে কহিল, "যদি ওর ঘাড় ভেঙ্গে দিস্! থাক্ রে, সৈরবী এলে তোর কোলে দিতে বলবো!"

এ-সম্বন্ধে অনিন্দিতার মনে একটু সংশয় ছিল, নহিলে সে সুলতার

অনুমতি লইতে না গিয়া একেবারেই খোকাকে তুলিত। কিন্তু সুলতা তাহাকে এমন আনাড়ি বলিয়া জানে—সে তুলিতে গেলে খোকার ঘাড় ভাঙ্গিয়া যাইবে! ইহাতে তার দুঃখের সীমা রহিল না। দিদি পাগল নাকি? অনিন্দিতা এত-বড় মেয়ে, ঐ ছোট্ট খোকাকে গুছাইয়া কোলে তুলিয়া লইতে পারিবে না? তার ঘাড় ভাঙ্গিয়া দিবে? না, এ-অপমান সহ্য হয় না!

অনিন্দিতা বিছানার ধারে গিয়া খুব সন্তর্পণে তলায় পাতা অয়েলক্লথ-শুদ্ধ খোকাকে তুলিয়া লইল। নাড়া পাইয়া ঘুমন্ত খোকা আড়মোড়া দিয়া নিজেকে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া পুটপুট করিয়া চোখ মেলিয়া তাকাইল। তারপর তন্দ্রাবিজড়িত গলায় বার কয়েক "আঁ, আঁ" শব্দ করিয়া আবার অনিন্দিতার কোলে ঘুমাইয়া পড়িল। অনিমেষ নেত্রে অনিন্দিতা তার পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল। তার কি এক নূতন রকমের অনুভূতি! কি যেন এক অনাস্বাদিত নব ভাবের উন্মেষ! সে একাগ্রদৃষ্টিতে খোকার পানে চাহিয়া রহিল।

খানিক পরে ডাকিল, "দিদি!"

সুলতা অনিন্দিতার মুখের দিকেই স্থির নেত্রে চাহিয়াছিল। তার অধর-প্রান্তে মৃদু হাসি। অনিন্দিতার মনের ভাব তার অবিদিত ছিল না। সে উত্তর দিল, "কি রে?"

"তুমি যখন শ্বশুরবাড়ী যাবে, খোকাকে নিয়ে যাবে তো?"

এ-প্রশ্ন বুঝিয়া উত্তর দিতে সুলতা কেমন কুণ্ঠা বোধ করিল। সে জানে, সত্য জবাব দিলে অনিন্দিতা খুশী হইবে না—মিথ্যা বলিলেও বিশ্বাস করিবে না। দু-দিক সামলাইয়া তাই সুলতা বলিল, "আর কাকেও তো বলতে পারি না—মায়েদের সময় কৈ? তবে তুই যদি ভরসা করে ওকে রাখতে পারিস, তাহলে তোর কাছে রেখে যেতুম। কিন্তু সে-কি তুই পারবি? এই তো একরত্তি ছেলে—কেবলি চ্যাঁচাবে

—সব-সময় নিয়ে থাকতে হবে। তুই কিছুই করতে পারবি না তখন —বলবি, দিদি কি শত্রুতাই করে গেল!"

"ককৃখনো না! সে আমি বলবোই না, তুমি তা জানো। ওপোর চালাকি করচো, আমি বেশ বুঝতে পারছি। কিন্তু, ও খাবে কি? সেই না মুস্কিল!"

সুলতা স্মিত মুখে কহিল, "তার জন্য কি! একটা ছাগল পুষিস, না হয় একটা গাধী।"

অনিন্দিতা ঈষৎ চিন্তিত হইল, তারপর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "সেই মায়ের অসুখের সময় সিতাংশুর জন্যে যেমন দুধ দেবার লোক রাখা হয়েছিল—যদি তেমনি রাখা হতো, তাহলে ওকে খুব রাখা যেতো।"

সুলতা হাসিমুখে কহিল, "তা যেতো। কত মা-মরা ছেলে ঐরকম করেই তো মানুষ হয়।"

ভয়ার্ত্ত আকুল কণ্ঠে অনিন্দিতা বলিয়া উঠিল, "দিদি!"

তারপর আর কোনো কথা নয়—দু-চোখে ভর্ৎসনার আগুন যেন। চকিতে সে-আগুন নিভিয়া কেমন বাষ্পার্দ্রতা! অনিন্দিতা কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল—দু-চোখের একাগ্র দৃষ্টি সুলতার মুখে নিবদ্ধ!

হঠাৎ এ-কি? সুলতা ডাকিল, "অনি!"

অনিন্দিতা ততক্ষণে একটু সামলাইয়া লইয়াছে। প্রথমেই খোকাকে ধীরে ধীরে তার বিছানায় সুলতার পাশে শোয়াইয়া দিল, তারপর খাট হইতে নামিয়া ক্ষীণকণ্ঠে মৃদুস্বরে কহিল, "না দিদি, তোমার খোকা তোমারই থাক—আমি চাই না।"

বলিতে বলিতে বাষ্পাবেগে কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইয়া আসিল। কোনো দিকে না চাহিয়া সে তাড়াতাড়ি আঁতুড় হইতে বাহির হইয়া গেল।

সুলতা তখনই তার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছিল। সেও অপ্রতিভ হইয়া ব্যগ্র স্বরে ডাকিল, "অনি! অনি। ওরে, শুনে যা।"

অনিন্দিতা ফিরিল না। সে জানিত, এখন দিদির সামনাসামনি দাঁড়াইয়া কথা বলা তার পক্ষে সম্ভব নয়!

ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতেই তার দু-চোখে বন্যা বহিল। অজানা ভয়ে মন যেন ভারী পাথর হইয়া উঠিল!

পা টিপিয়া সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া সে খিড়কির বাগানে চলিয়া গেল। সেখানে শ্বেতপুষ্পে আচ্ছন্ন একটা ডগডগে-ডগাওয়ালা লাউ-মাচার পিছন দিকে বসিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাইল, দিদির আর খোকার মঙ্গল কামনা করিয়া! কতক্ষণ এখানে আছে, খেয়াল নাই।

সমারোহে ষেঠেরা-পূজা এবং আটকৌড়ে হইয়া গেল। ছ'দিনের দিন সুলতার শ্বশুরবাড়ী হইতে পুরোহিত আসিয়া ষোড়শোপচারে ষষ্ঠী-দেবীর পূজা করিয়া গেলেন। বাড়ী-বাড়ী নবকুমারের দীর্ঘায়ু এবং সুখ-স্বাস্থ্য কামনায় ব্রাহ্মণের পদধূলি আনা হইল—নূতন বাসনে মিষ্টান্ন বিলানো হইল। বাড়ীর দাস-দাসীরা নূতন কাপড় পাইল—মিষ্টান্ন পাইল; যাহারা অনেকদিনের লোক, তাহারা টাকা পাইল। অনিন্দিতা মায়ের কাছে দেখাইয়া খোকার জন্য চারকাঁটার উলের মোজা আর টুপি বুনিতে আরম্ভ করিল। আঁতুড়ঘরের দ্বারের কাছে যখন-তখন সে আসিয়া খানিকটা বোনা লইয়া বসে। ভিতরে গিয়া খোকাকে লইয়া টানাটানি আর করে না। সুলতা এ-পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করে, কিন্তু তার কারণ খুঁজিয়া পায় না। এ যে ঠিক অভিমান নয়, তা সে বোঝে। একটু যেন ভারীক্কি ভাব,

একটু যেন নিঃস্পৃহতা। তার অভিমান সে ভালো করিয়াই জানে, কিন্তু এই নূতন ভাব তার অপরিচিত। একদিন প্রশ্ন করিল, "কিরে, তুই যে আর খোকাকে কোলে নিস না?"

অনিন্দিতা জবাব দিল, "একটু বড় হোক। এখন নিতে ভয় করে।" তারপর এ-সম্বন্ধে পাছে আলোচনা ওঠে, সেই ভয়ে সে হঠাৎ প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা, ওর কি নাম হবে—কৈ, কিছু ঠিক হচ্ছে না তো!"

সুলতা নিজেও এ-সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত নয়, তাই সঙ্গে-সঙ্গে বলিল, "তুই সেদিন বলছিলি, অনিল!"

"ওদের পছন্দ হলে তবে তো? শুধু তোমার মতেই তো হবে না।"

সুলতা কহিল, "তা এ-নাম ওদের পছন্দ না হবেই বা কেন? নামে বেশ মিল থাকবে, ভালোই হবে।"

তাহারই দেওয়া নাম খোকার হইতে পারিবে, জানিয়া আনন্দে অনিন্দিতা আর স্থির থাকিতে পারিল না, ছুটিয়া আসিয়া ঘুমন্ত খোকাকে একটু নাড়িয়া-চাড়িয়া ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিয়া গেল। হঠাৎ প্রচণ্ড আদরের তাড়নায় শিশু কাঁদিয়া উঠিল।

আঁতুড়ের ঝি সৈরবী বিরক্তি-কুঞ্চিত ললাটে তার বিরাম-শয্যা হইতে উঠিয়া আসিয়া ক্রন্দনরত শিশুকে বিছানা-সমেত কোলে তুলিতে তুলিতে অপ্রসন্ন কণ্ঠে মন্তব্য করিল, "এই তো সব্বাই আসে, কিন্তু ছোটদি-মণি এলেই ছেলে কাঁদবে!"

এ-টিপ্পনীতে অনিন্দিতা অপ্রতিভ হইলেও ধমক দিয়া বলিল, "ছ্যাখ্ সৈরবী, মিথ্যে কথা বলিসনে! আমি বলে আজ সতেরো দিন পরে খোকাকে এই ছুঁলুম!"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

অপারেসনের ঘা সারিয়া সুনীলের ছেলে দেখিতে আসিতে বিলম্ব হইল। একুশ দিনে ষষ্ঠী-পূজা সারিয়া সুলতা সেদিন ছেলে কোলে বড় ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে। সুনীলকে বেশ রোগা দেখাইতেছিল। তার সহাস্য-মুখে যাতনার ছায়া এখনো যেন লাগিয়া আছে! লক্ষ্য করিয়া সুলতা ছোট একটা নিশ্বাস ফেলিল। তারপর জিজ্ঞাসা করিল, "সম্পূর্ণ সেরে গেছে?"

"সম্পূর্ণর চেয়েও বেশী না সারলে কি আর দয়ালবাবু আমাকে ছেড়েছেন? জানো তো তাঁর হাতে রোগীর দশা হয় সেই কমলী নেই ছোড়তা হ্যায়!"

সুলতা মৃদু হাসিল।

ছেলের দিকে চাহিয়া মুখখানা বিকৃত করিয়া সুনীল বলিল, "এক্কেবারে বেরাল-ছানা! একে কিন্তু আমি তুলতে পারবো না। জানলে সু, হাতটা-পাটা মট্ করে ভেঙ্গেই ফেলবো, বড় হয়ে বাপকে শেষে শাপ-শাপান্ত করবে। কি বলো? তুমি রাগ করবে না তো? আমি বলি, দুটো মাস যাক অন্ততঃ!"

"আহা, আমি যেন ওর হাত-পা ভেঙ্গে দেবার জন্যে ওকে তোমায় নিতে দেবো!"

"সে তোমার মেহেরবাণী। তোমার ছেলে, তুমি ওর জন্যে যে বিধান করবে, আমাকে মানতেই হবে! কিন্তু সু, তোমার ছেলে নেহাৎ বেইমানী করেছে, তা দেখেছো, বোধ হয়। ওর চেহারা সুলতাত্ব-বর্জ্জিত, আগাগোড়া সুনীলত্বময়! তা একরকম ভালোই হয়েছে, পথে হারাবার ভয় রইলো না! যারা আমায় চেনে, তারা

ওকে ঠিক খুঁজে আনবে। তা, তোমার ভগ্নী কোথায়? এসে পর্য্যন্ত তাকে আজ দেখতে পাচ্ছি না! বিয়ের জল পেয়ে কেমন হলো, দেখি।"

সুলতা খোকার গায়ের ঢাকা ভালো করিয়া গুছাইয়া দিতে দিতে বলিল, "কেন, দাতুর কাছে নেই? এখন তো তার পড়ার সময়।"

"না, দেখলুম না তো।"

বলিতে বলিতে দ্বারের বাহিরে অনিন্দিতার সাড়া পাওয়া গেল। একটা সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিতে করিতে সে ঘরে ঢুকিল—

> "মুঞ্চ নৃপ, মুঞ্চ নৃপ, পঞ্চমুখকামিনী,
> পঞ্চ বদনেন সহ পঞ্চশর-দামিনী।"

"আয়াহি বরদে দেবী, চৌক্ষরে ব্রহ্মবাদিনী!—এতক্ষণ কোথায় ছিলেন? সূর্য্যোপাসনায় নাকি?"

সুনীলের সামনে আসিতে কেমন অনিন্দিতা একটু লজ্জা বোধ করিতেছিল। অতীতে সুনীলের কাছে অনেক কথা বলিয়াছে। সেই সব কথা মনে করিয়া পরাজয়ের লজ্জা বড় করিয়া মনে জাগিতেছে! দাতুর ভরসায় বড় গলা করিয়া সুনীলকে সে বলিয়াছিল, ব্রহ্মচারিণী হইবে, বিবাহ করিবে না! এখন? সুনীলবাবু কি না বলিবেন? কিন্তু কতক্ষণ লুকাইয়া থাকা যায়? রোগশয্যা ছাড়িয়া এতদিন পরে সে আসিয়াছে, অনিন্দিতা তার কুশল জিজ্ঞাসা করিবে না? না হয় দু'টা পরিহাস শুনিতে হইবে! যখন পণ করিবার মত শক্তি নাই—তখন লোকে তো হাসিবেই। তার মনে হইল—

> ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন!

কিন্তু সূর্য্যোপাসনার কথা সুনীলবাবু কেন বলিলেন? অনিন্দিতা

এ-কথার অর্থ বুঝিল না। তবে এই ভাবিয়া খুশী হইল যে, সুনীলবাবু অতীতের সেই ব্রহ্মচারিণী হওয়ার কথা পাড়েন নাই—অন্য কথা পাড়িয়াছেন। তাই সে প্রশ্ন করিল, "সূর্য্যোপাসনা! সে তো পারসীরা করে।"

মেঝের বিছানায় সুনীল বেশ চাপিয়া বসিয়াছিল—গম্ভীর মুখে বলিল, "সে তো ইতিহাসের ব্যাপার। এ ছাড়া আর কোনো খবর জানো না? সূর্য্যোপাসনা কোন্ সম্প্রদায় করে না?"

অনিন্দিতা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া ছাড়া-ছাড়া ভাবে বলিল, "শুনেছি, তবে ঠিক জানি না, তারা কারা, আর কি করে? পঞ্চ দেবতারই পূজা হয়, জানি—শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, গাণপত্য আর সৌর।"

"জানো যদি, তবে ন্যাকামি করছিলে কেন! তোমায় এখন থেকে আমি 'সৌরী' বলে ডাকবো, ভেবেছি।"

অনিন্দিতা যেন আঁৎকাইয়া উঠিল, "রামোঃ! দিদির ঝি সৈরবী হতে গেলুম কি দুঃখে! কেন, কি ব্যাপার, বলুন তো? হঠাৎ এতদিন পরে এসে আমাকে নিয়ে পড়লেন যে! আর আমি হঠাৎ সৌরী হবো কেন?"

"দাদুকে বলতে হবে, দাদুর 'কালিদাস' "সূর্য্যপ্রভব-বংশে" পড়ে "চপলমতি" হয়ে গিয়েছেন! এবং—"

"যান, আপনি ভারী দুষ্টু!" এতক্ষণে অনিন্দিতা ও-কথার অর্থ বুঝিল।

হাসিয়া সুনীল বলিল, "দুষ্টু হতে গেলুম কি জন্যে? মিহির সূর্য্যের নাম নয়? এই বুঝি অমরকোষ মুখস্থ করেছো? তা 'সৌরী' নাম তোমার পছন্দ না হয়, আরও কত নাম আছে। বেশ "ছায়া দেবী" বলতে পারি? মার্ত্তণ্ডানী, বিবস্বামী, কি ভাস্করী? কিন্তু

ও-সব নাম বললে, তুমি আমায় মেরেই ফেলবে! আচ্ছা, ও থাক। এখন বলো, বরকে কেমন লাগলো, নিন্দিতা? খুব সুন্দর, না?"

অনিন্দিতার 'অ' লুপ্ত করিয়া সুনীল নিন্দিতা সম্বোধন প্রায় কায়েমি করিয়াছে বহুদিন চেষ্টা-চরিত্রের পর। অনিন্দিতা সগর্ব্বে উত্তর দিল, "ছাই, ছাই!"

"কি ছাই? তোমার মন? না, আমার যে-মুখ এমন প্রশ্ন করে, সেই মুখে ছাই?"

"মাগো! কি মুখ আপনার! যান! আপনি ভারী ইয়ে হয়েছেন—আপনার সঙ্গে আমি কথা কইবো না!" অনিন্দিতা রাগিল।

"পুঁজি করে রাখা নেহাৎ দরকার! বাজে খরচ করবে না, সে তো জানা কথা। আমি কিন্তু কথা কইবো, তা মুখে ছাই যতই ঢালো!"

অনিন্দিতা রাগে গরগর করিয়া ঝঙ্কার তুলিল, "আমি কখন আপনাকে ও-কথা বললুম, বলুন তো? দিদিকে বলে দেবো, আজকাল আমায় আপনি বড্ড জ্বালাতন করেন! কেন, আর কি কোনো কথা নেই?"

সুনীল চিন্তার ভাণ করিয়া বলিল, "আর কোনো কথা? হ্যাঁ, আছে। সে-ভদ্রলোক আসছে কবে? তুমিই বা সেখানে কবে যাচ্ছো?"

আর রক্ষা আছে! সাপের লেজে পা পড়িল! অনিন্দিতা খ্যাঁক করিয়া উঠিল, "তা আর না! আমি আর যাচ্ছি কি-না ওদের বাড়ী! দাদু আমায় যেতে দেবেন না, বলেছেন। যে-কষ্টে দাদুকে ছেড়ে তিন দিন ছিলুম—আপনি তা কি করে বুঝবেন!"

সুনীল মুখ টিপিয়া হাসিল, "আর দাদু যদি তোমার দিদিকে

যেমন ঠেলেঠুলে পাঠিয়েছিলেন, তেমনি ঠেলেঠুলে পাঠিয়ে দেন ?"

অনিন্দিতা উত্তর দিল, "সব্বাই দিদি নয়! ও যেমন ভালো মেয়ে, আমি সে-রকম নই! আমি যাবো না—দাদুর পা ধরে পড়ে থাকবো, নড়বো না!"

"দাদু যদি নড়া ধরে তুলে গাড়ীতে তুলে দেন? পাহারাওয়ালা সঙ্গে থাকবে—সে ঠিক ম্যানেজ করে নেবে! আচ্ছা, কেউ কারো হক ছাড়ে কখনো? বলো—আমি ছেড়েছি?"

অনিন্দিতার অভিমান কানায়-কানায় ভরিয়া উঠিতেছে, কোনো-মতে অহঙ্কার বজায় রাখিতে প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া সে বলিল, "আমি যাবো না।"

চোখে জল ভরিয়া আসিয়াছে, পড়ে-পড়ে!

ব্যাপার দেখিয়া সুনীল নরম সুরে ঈষৎ অপ্রতিভ ভাবে কহিল, "তুমি বদ্ধ পাগল।"

"আর আপনি? আপনি একটি—"

"বলো, থামলে কেন? বলো? আমি কি? গর্দ্দভ?"

সজল চোখের মেঘে এবার শরতের রৌদ্র ফুটিল, "আহা, তা কখনো বলতে পারি! আপনি হলেন বড় ভগ্নীপতি—বয়সে আপনি কত বড়—বললে পাপ হবে না?"

সুনীল হাসিয়া ফেলিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, "বলছিলে তো। এখন আবার বিনয় দেখানো হচ্ছে!"

অনিন্দিতা নিজেকে জয়ী বুঝিয়া সংহত অভিমানে বলিল, "আহা, সেজন্য তো বললুম না! তা যাক্, ওসব পাঁচ-পরেদের কথা এখন থাক, অনেক দিন আপনি গল্প বলেননি, আজ এখানে খেয়ে যাবেন, খাবার পর গল্পের আসর যদি আজ না বসে, তাহলে ভীষণ আড়ি

করে দেবো আপনার সঙ্গে। দাদুর কাছে অনেকক্ষণ যাইনি, এখন চললুম। দেখবেন, আমার কথা মনে থাকে যেন।”

বিবাহের পর অনিন্দিতাকে তেমন সঙ্কটে পড়িতে হয় নাই—এখানে তেমনি পড়াশুনা চলিতেছে। সেই মাষ্টারমশাই, পণ্ডিতমশাই এবং দাদুর কাছে আগেকার মত সংস্কৃত কাব্য-ব্যাকরণ পড়া চলে। মিহির নিমন্ত্রণে আসে—কিন্তু রাত্রে থাকে না। সাজসজ্জা করিয়া সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে অনিন্দিতা তাকে একবার দর্শন দিয়া আসে। রাগ হয়, তবু আসিতে হয়। ভাবে, কতক্ষণের জন্য বা!

শ্বশুরবাড়ী হইতে তত্ত্ব-তাবাস আসে—অনিন্দিতার সেদিকে লোভ না থাকুক—তবু মেয়ের মন—পাঁচজনে ভালো বলে, শুনিয়া আনন্দ হয়।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

এমনি করিয়া দিন কাটিতে কাটিতে জ্যৈষ্ঠ মাস আসিয়া পড়িল। এবং জ্যৈষ্ঠ মাসে জামাইষষ্ঠীতে নূতন জামাইদের নিমন্ত্রণ হইল। অপরাহ্ণে জলযোগের পর মিহির বাড়ী ফিরিয়া গেল। তাহাকে সেই সর্ত্তেই নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। সুদেষ্ণার বর বিশ্বজিৎ রাত্রিবাসের আমন্ত্রণ পাইয়াছিল, কাজেই মিহিরের সঙ্গে তার এক-যাত্রায় পৃথক ফল ফলিয়া গেল।

মিহির বাড়ী ফিরিবার পূর্ব্বে সজ্জিতা অনিন্দিতাকে টানিয়া আনিয়া মিহিরের কাছে পৌঁছাইয়া দিয়া সুদেষ্ণা দরজা বন্ধ করিয়া দিল। সে জানিত, অনিন্দিতার পক্ষ হইতে এতটুকু আগ্রহ না থাকিলেও মিহিরের দিক হইতে শ্বশুরবাড়ী আসিয়া পত্নীর সঙ্গে সম্ভাষণে নিস্পৃহা নাই! একে দাদুর এই নাবালিকা-আদুরীর স্বামী হইয়া বাঙ্গালী ঘরের জামাইদের অবশ্য-প্রাপ্য আপ্যায়নে তার রীতি-মত ব্যাঘাত ঘটিতেছে, তাই বলিয়া ইহার উপর এতখানি অত্যাচার সুদেষ্ণার ভালো লাগে না! অনিন্দিতা কিন্তু আগাগোড়া ক্ষেপিয়া আছে। তাহার সহিত মিহিরের এমনি অস্বাভাবিক ধরণের ব্যবস্থা লইয়া বাড়ীর লোক যেরকম হাসি-তামাসা করে, মিহিরকে সাতশোবার বেচারা বলিয়া দুঃখ জানায়, তাহাতে অনিন্দিতার গা জ্বলিয়া যায়। এতই যদি অত্যাচার, তবে বেচারা বলা কেন?

নিজের দিক দিয়াও তার বিপদ কম নয়! দাদুর বিচার করিবার ভরসা নাই,—সকল অপরাধ আসিয়া জড়ো হইতেছে তারই মাথায়! দাদুর আদুরে বলিয়াই তার স্বামী বেচারী এই অবিচার ভোগ করিতেছে—অনিন্দিতা রাগিয়া আগুন হয়! লোকে তার কথা

লইয়া হাস্য-কৌতুক করিবে, এ তার সহ্য হয় না। সুদেষ্ণা শুধু সমালোচনা করে না, মিহিরকে সে একান্ত সহানুভূতি করে এবং যতটুকু সম্ভব তার দুঃখ মোচন করিতে চায়। সুনীতির মারফৎ মায়ের অনুমতি আদায় করিয়া অনিন্দিতাকে ধরিয়া সে তার চুল বাঁধিতে বসে। তখন আলবার্ট ফ্যাশনে চুল বাঁধার রেওয়াজ উঠিয়াছে—সুদেষ্ণার মায়ের এ ফ্যাশন খুব অপছন্দ, কলিকাতার নাট্যালয়ে তিনি এই বিশেষ ফ্যাশন সব আগে দেখিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু সুদেষ্ণা এ সম্বন্ধে অনেকখানি বিদ্রোহী—সুবিধা পাইলে অন্ততঃ ঘণ্টা-কয়েকের জন্যও সে চুল বাঁধার এই নূতন ফ্যাশন করিবেই।

আজ অনিন্দিতার চুল বাঁধিবার অধিকার পাইয়া সে নিজের ইচ্ছামত করিয়া বাঁধিল। লাল গুলবসানো সাদা-শাড়ী পরানোয় একান্ত নারাজ—অনিন্দিতাকে ফিকা হলুদে রংয়ের উপর সবুজ আর লালের বড়-বড় ফুলদার একখানা শাড়ী সামনে পিছনে কোঁচ দিয়া পরাইয়া দিল। জরির কাজ করা বেল্ট কোমরে আঁটিয়া শুধু আটপৌরের বদলে তোলা হার পরাইয়াছিল—কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ নব-বিবাহিতার এমন দৈন্য দেখানো বরদাস্ত করিতে রাজী হইলেন না। অগত্যা বিরক্ত হইয়া সে তাঁহাদের নির্দ্দেশে দুহাতে আটগাছা চওড়া চুড়—মোটা বালা, গলার হারের সঙ্গে মুক্তার শেলী, কাণে ক'গণ্ডা মুক্তার ঝালর দেওয়া মাছ-ইয়ারিং আর পায়ে ঘুঙুর-গাঁথা মল পরাইয়া দিল! মাথায় সিঁথি সে কিছুতেই দিতে পারিল না—একটা মল্লিকা ফুলের মালা,—সামনে ফুটন্ত গোলাপ টিকলীর মত করিয়া পরাইয়া দিল। সুদেষ্ণা সাজায় ভালো। তার রুচি আছে। অনিন্দিতা যদি অমন চটিয়া না থাকিত, আয়নার সামনে দাঁড়াইলে সেও মনে-মনে খুশী হইত। কিন্তু তাকে লইয়া এই রকম সাজানোয় যে রংতামাসা চলিতেছে, এ তার নিতান্তই অসহ্য!

এমন অবস্থায় মিহিরের মনও খুব প্রসন্ন ছিল না। বিবাহের পূর্ব্বেই সে এমনি একটা বাক্য-দানের খবর শুনিয়াছিল, কিন্তু সে বাক্য যে এমন বাড়াবাড়ি কাণ্ড—তা' সে মনে করে নাই। তাহা হইলে তাকে এ-বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করা কেন? ডাকিয়া আনিয়া ফিরিয়া যাও বলার মত এ-ব্যাপারটা বাহিরের আনাড়ি লোকদের কাছে প্রহেলিকার মত ঠেকে। তার বাড়ীতেও ইহা লইয়া বিস্তর আলোচনা হয়। বোনেরা আড়ালে বলাবলি করে, "এত আদুরে মেয়ে—জানিনে, কি রকম হবে! এ বাড়ীতে এসে ঘর করবে তো?" গুরুজনরাও ঈষৎ বিস্ময় এবং সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলেন—"এ আবার বড্ড বাড়াবাড়ি, বাপু! তিন বছর ধরে এই রকম চলবে? এ কি হিন্দুস্থানীদের গাওনার ব্যবস্থা! কে জানে বাবা—জামাইকে নিয়ে যাওয়াই বা কেন?"

কর্ত্তৃপক্ষ এমন সঙ্কল্পও করেন, যে এবার জামাইকে নিমন্ত্রণ করিলে পাঠানো হইবে না। কিন্তু কার্য্যকালে সে সঙ্কল্প কোথায় ভাসিয়া যায়! জামাই হিসাবে নয়, আত্মীয় হিসাবে মিহির গিয়া নিমন্ত্রণ খায় এবং দাদুর সঙ্গে দেখাশুনা করিয়া আসে। অনিন্দিতাও একবার দেখা দিয়া যায়। দুজনে কথাবার্ত্তা বড় একটা হয় না।

একদিন মিহির একটা কবিতা লিখিয়া তাহাকে উপহার দিয়াছিল। অনিন্দিতা পড়িয়া ভয়ানক হাসিয়াছিল—হাসিয়াই অপ্রতিভ হইয়া ঘরে আর এক মিনিট দাঁড়ায় নাই—তখনই ছুটিয়া পালাইয়া গিয়াছিল। বাহিরে আসিয়া দিদির কাছে গিয়া কবিতার কাগজখানা তার গায়ে ছুড়িয়া বেদম হাসিতে হাসিতে লুটাইয়া পড়িয়াছিল।

"কিরে, কি হলো তোর? এত হাসছিস কেন?" সুলতা যত

জিজ্ঞাসা করে, সে তত হাসিতে থাকে। শেষে কোনোমতে বলিল, "পড়ে দেখনা তুমি!"

সুলতা কবিতা পড়িতে পড়িতে ক্রমাগত হাসি চাপিয়া গাম্ভীর্য্যের ভাণ করিয়া কহিল, "কেন—কি হয়েছে? এতে হাসির কি আছে?"

"নেই?" বলিয়া অনিন্দিতা আবার হাসিয়া উঠিল, "মিথ্যুক! সুনীলবাবুর হাওয়া লেগেছে গায়ে! কি পদ্যই লিখেছেন! আহা!"

অনিন্দিতার হাসি আর থামিতে চায় না!

কবিতাটা সুলতা আবার মনে মনে পড়িল—পড়িয়া কহিল, "অমন হাসবার মতন নয়! মন্দ কিছু লেখেনি! তোর সব বাড়াবাড়ি! একে বেচারাকে ভালো মানুষ পেয়ে তোরা যা নয়, তাই করিস! তার উপর—"

"তাইতো!" অনিন্দিতার হাসি থামিল, "অত গোবেচারা নন গো! বেশ কুটুস্-কুটুস্ কামড় দিতে জানেন। বেচারা, না, হাতী! ঐ কবিতাটিই তো বেশ ভারী ওজনের চড় মারা! নয়—বলতে চাও?"

"কোথায় আবার চড় মারতে দেখলি! এই তো লিখেছে—

নিঠুর হৃদয় তব, নিঠুর তোমার প্রাণ,
পাষাণে গড়েছে বিধি—ইথে নাহি কোন আন!
বিরহ-নদীর কূলে কাঁদি আপনারে ভুলে,
তুমি সুখ-সিন্ধুনীরে হয়ে আছ ভাসমান।

কেন! কি মন্দ লিখেছে, বাপু! আমার তো খুব ভালো লেগেছে। তুই লিখলে এর চাইতে ভালো করে লিখতে পারতিস নাকি?"

"না,—তা কি আর পারতুম! 'ইথে' 'ভাসমান'—এ-কথা আমি লিখতুম না। পদ্যর কি বা ভাব, আর কি ভাষা!"

অনিন্দিতা অবজ্ঞায় ঠোঁট উল্টাইল ; তার পর কাগজখানা তুলিয়া সনিশ্বাসে কহিল, "হাতের লেখাটা কিন্তু ভালো। আমার হ্যাণ্ডরাইটিং যদি একটু ভালো হতো !"

মৃদু হাসিয়া সুলতা বলিল, "তার যেমন খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই—কবিতা লিখে তোকে দেছে ! সাধে কথায় বলে—অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্ !"

অনিন্দিতা কহিল, "সেই ভালো ! ভদ্রলোককে ওই শ্লোকটি শুনিয়ে দিও—তাহলে আর এ রকম পদ্য লিখে কাগজ-কালি নষ্ট করবেন না।"

সুলতার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সে লাফাইতে লাফাইতে বাহির হইয়া গেল—বলিতে বলিতে গেল, "তুমি সুখ-সিন্ধুনীরে হয়ে আছ ভাসমান ! হিহিহিঃ—হিহিহিঃ—হিহিহিঃ—"

সুলতা স্নেহ-হাস্যে আত্মগতভাবে কহিল, পাগলী !

কিন্তু এ কবিতার সুরের খেদপূর্ণ রেশ্ দিদি ভুলিতে পারিল না। দাদুর বিধান যত ভালো হোক, বয়সে ছেলেমানুষ, স্বভাবে তার চেয়ে ছেলেমানুষী-ভাব হইলেও অনিন্দিতাকে পরের ঘরে যাইতে হইবে। এ যে উচিত নয়—তাহা সে ভালো করিয়াই জানে। কিন্তু মিহির বেচারীর সঙ্গে অনিন্দিতার এই অদ্ভুত ব্যবহার—ইহাতে সে মনে বেশ ব্যথা বোধ করে। বোন এদিকে লজ্জা-সরমের ধার ধারে না—অথচ মিহিরের সঙ্গে নির্ব্বাক অভিনয় করিয়া আসে কেন, সে-ই জানে ! বিবাহের সময় মিহিরদের বাড়ীতে কথাবার্ত্তা কহিয়াছিল তো—কি বই পড়ে, ভাইবোন কটি, এমন কি দিদির কবি-খ্যাতিও রটাইতে ভোলে নাই। হঠাৎ আজকাল এ বিধান কেন, সে-ই জানে ! মিহির

হয়তো এই নির্লিপ্ত মৌনকে তার প্রতি অবজ্ঞা ভাবিয়া মনে মনে দুঃখ পায়। মনে মনে একটা কৌশল সে স্থির করিল।

দাদুর শরীর কিছুদিন হইতে কেমন ভালো যাইতেছে না। ডায়াবিটিস বেশ জোর করিতেছে। প্রায়ই তিনি অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করেন—শরীর অসুস্থ হয়। কলিকাতার বড় কবিরাজ ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া বায়ু পরিবর্ত্তনের উপদেশ দিয়াছেন। বায়ু পরিবর্ত্তনে যাওয়া ঠিক। যাওয়ার পূর্ব্বে একদিন নাতনী—নাতজামাই—সকলের নিমন্ত্রণ হইল। মিহিরও আসিবে। অনিন্দিতাকে ধরিয়া সুলতা বলিল, "হ্যাঁরে, মিহির যে কবিতাটা লিখেছিল, তার জবাবে তুই একটা লেখ তো—দেখি, তার লেখা ভালো, না, তোর লেখা ভালো!"

"লিখতে আমার বয়ে গেছে!" বলিয়া অনিন্দিতা বড় বড় দুই চোখ কপালে তুলিয়া দুষ্টামির হাসি হাসিয়া কহিল, "তুমি ভারী চালাক! ওই করে তুমি আমায় দিয়ে লিখিয়ে তোমার ভক্তকে সেটা প্রেজেণ্ট করবে—হুঁ-হুঁ, আমায় এত বোকা পাওনি।"

সুলতা মনে মনে বলিল, না, রাক্ষসীকে কিছুতে পারিবার যো নাই! মুখে কহিল, "দূর—তা' কেন? তুই অত গুমোর করলি, তাই দেখতে চাইছি। না লিখলি, না লিখবি। আজকাল আমার একটা কথাও কি আর তুই শুনিস্! কিছুই আর তোকে কোনো দিন বলবো না।"

"বেশ, বলো না! দেখা যাবে।"—বলিয়া অনিন্দিতা পলাইয়া গেল। কিন্তু গিয়া শান্তি পাইল না। দাদুর আর দিদির কথা না রাখিতে পারা—তার পক্ষে সমান দুঃসাধ্য! যদি দিদি ভাবে, অনিন্দিতার বিবাহ হইয়াছে, সে আর আগের মতন দিদিকে

ভালোবাসে না? না, ছি, তা হয় না! সেও দিদিকে কতবার এ-কথা বলিয়াছে। দিদি কেন তাহা না ভাবিবে?

অনিন্দিতা নিরুপায়! কোনো মতে লুকাইয়া কাগজ-কলম লইয়া পদ্য লিখিতে বসিল। পরের লেখার সমালোচনা করা যত সহজ, নিজে লেখা তেমন সোজা নয়—বিশেষ কাহারও ফরমাশে যদি কিছু লিখিতে হয়! সাংসারিকতার দিক দিয়া মূর্খ হইলেও কাব্য জগতের সহিত অনিন্দিতার সম্পর্ক তার বয়সের চেয়ে কিছু বেশী। তাই আর সব বিদ্যার চেয়ে কাব্যে তার জ্ঞান একটু বেশী। পেন-কলমের মুখ চিরিয়া কালি ছিটকাইয়া পড়িলে কি হয়, মসীলিপ্ত আঙুলে কোনোমতে দিদির ফরমাশী কবিতা দু'তিন ছত্র লেখা—কাটিয়া-কুটিয়া শেষে এমনি দাঁড় করাইল।

'যামিনী আগতা হলে চক্রবাক-চক্রবাকী
দু'জনেই কেঁদে মরে নদীর দু'কূলে থাকি!
প্রভাত হইবে যবে, মহোল্লাসে মহোৎসবে,
এক সাথে রবে দোঁহে—মিলন রবে না বাকি!'

সুলতা ছেলেকে দুধ খাওয়াইতেছিল—কাগজখানা নুটী পাকাইয়া অনিন্দিতা তার গায়ে ছুড়িয়া দিল—গোমড়া মুখ করিয়া বলিল, "তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে! নাও তোমার কবিতা। কিন্তু খবর্দ্দার, শুধু তোমার জন্য লেখা—আর কাকেও তুমি দেখাতে পাবে না—তা কিন্তু বলে দিচ্ছি! আর পড়েই ছিঁড়ে ফেলবে। তা যদি না করো তো জীবনে কখনো আর তোমার কোনো কথা শুনবো না।"

কাগজখানা তুলিয়া লইয়া সুলতা আঁচলে গিঁট দিয়া বাঁধিয়া ছেলেকে দুধ খাওয়াইতে লাগিল। মৃদু ভাষে কি একটা যেন বলিল,

অনিন্দিতার কাণে গেল না। লজ্জায় সে তখন দিদির কাছ হইতে পলাইয়া গিয়াছে।

অনিন্দিতার সঙ্গে সেদিনকার সন্ধ্যায় যখন দেখা হইল, মিহিরের মন বেশ ভালো ছিল। রাত্রে থাকার জন্য দাদু নিজেই নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, এ-খবর পাওয়া গিয়াছে সুদেষ্ণার কাছে। দাদুর পাশের ঘরে, অর্থাৎ যে ঘরে দাদুর লাইব্রেরী—সেই লাইব্রেরী-ঘরে তাহাদের বাসর-শয্যা রচিত হইবে। তা হোক, এ কটা দিন তো ঈপ্সিতাকে পাওয়া যাইবে!

খোঁপায় বকুলফুলের মালা জড়ানো—গলায় জুঁইফুলের গোড়ে মালা—ফিকা নীল রঙের শাড়ী পরা—মুখখানা ভারী করিয়া অনিন্দিতা ঘরে গেল। সে ঘরে ঢুকিতেই মিহির আগাইয়া আসিয়া হাসিমুখে সম্বর্দ্ধনা করিল, "এসো চক্রবাকি!—চক্রবাকের জন্য তোমারও চোখে তাহলে জল পড়ে! এ অমানিশা কবে প্রভাত হবে, বলতে পারো? কোন্ সুপ্রভাতে আমাদের মিলন হবে?"

অনিন্দিতা একেই আজ মিহিরের উপর চটিয়া আছে—তার কারণ, বৈকালে দাদুর কাছে বসিয়া অনিন্দিতা 'কুমারসম্ভব' পড়িতেছিল, তখন হঠাৎ সে-ঘরে মিহিরের আবির্ভাব হইল! অনিন্দিতা মাথায় ঘোমটা টানিতে পারে নাই—চকিত-নয়নে দেখিয়াছিল—সেজন্য মিহিরের অধরে কৌতুক-হাসির রেখা! দেখিয়াই তার রাগ হইয়াছিল! এ কি অভদ্রতা! না বলিয়া এমন চট করিয়া ঘরে ঢুকিয়া তাকে লজ্জায় ফেলা! এখন আবার দেখা হইতেই ঐ চক্রবাক-চক্রবাকীর কথা তোলা! তাছাড়া দিদির এ কি বিশ্বাসঘাতকতা! বারুদে যেন আগুন পড়িল! অনিন্দিতা ফোঁস

করিয়া উঠিল, "আমার তো চোখের জল ফেলবার জন্যে ঘুম হচ্ছে না! একটুও না—একটুও না!"

মিহির আবেগভরে তার হাতখানা ধরিয়া নিজের দিকে তাকে ঈষৎ টানিয়া কহিল, "তাহলে আমার কবিতার জবাব পাঠালে কেন? পরশুর ডাকে তোমার কবিতা পেয়েই—"

"কী? ও, সে পদ্য ডাকে পাঠানো হয়েছে! যাচ্ছি আমি দিদির কাছে! যত নষ্টের গোড়া দিদি, আমায় ভুলিয়ে ওটা লিখিয়ে নিয়ে তার এই কীর্ত্তি! ও আমি কাকেও লিখিনি—কারো কোনো পদ্যের জবাবেও নয়—এমনি আপনার মনে লিখেছিলুম!"

অনিন্দিতাকে আর ধরিয়া রাখা গেল না। মিহিরের আশাচন্দ্র অকাল-মেঘজালে ঢাকিয়া গেল! সে ভাবিল, না—অনিন্দিতার অন্ত সে কোনো দিনই পাইবে না!

প্রায় মাসখানেক বাহিরে কাটাইয়া বাড়ী ফিরিলে দেখা গেল, দাদুর স্বাস্থ্য আরও অবনতির দিকে নামিয়াছে—কোনো উন্নতি হয় নাই।

ছেলেমেয়েদের লইয়া করুণাময়ী শ্বশুরের সঙ্গে গিয়াছিলেন। আনন্দনাথও ছুটি লইয়া পিতার সাথী হইয়াছিলেন। সুলতা শ্বশুরবাড়ীতে; বড়দের মধ্যে শুধু অনিন্দিতা আর সুদেষ্ণা।

খোলা মাঠ, শ্যাম-শস্যক্ষেত্র, দূরে নদীতীরের ক্ষীণ আভাস, সুদূর-প্রসারী মুক্ত নীল আকাশের বৈচিত্র্য, অনিন্দিতার ভাবপ্রবণ মুগ্ধ চিত্তে মোহের তুলি বুলাইয়া দিয়াছিল। বাগানে ঢুকিয়া তন্ময় হইয়া সে মরসুমী ফুলের গাছ দেখিয়া বেড়ায়—ফুল লইয়া মনে-মনে

তাদের নায়ক-নায়িকা, রাজা, সেনাপতি কল্পনা করিয়া কত কাব্য, নাটক রচনা করে! স্নানাহারের কঠোর নিয়ম কতক শিথিল—তাই সব সময়ে আর সন্ত্রস্ত থাকিতে হয় না। কখনো সবুজ ভেলভেটের মত স্নিগ্ধ শ্যাম দূর্ব্বাদলের উপর শুইয়া সে গজ-শুণ্ড, অশ্ব-তুণ্ড আকাশের মেঘ দেখে। মেঘ দেখিতে দেখিতে কতক্ষণ কাটাইয়া দেয়। বাকী সময়টুকু দাত্তর কাছে থাকে—তাঁকে বই পড়িয়া খবরের কাগজ পড়িয়া শোনায়, নিজেও পড়ে। ইতিমধ্যে মিহিরের দু'খানা পত্র আসিয়াছিল—একখানা ফটকের পাশের ফাটলে ঢুকাইয়া দিয়া সে নিশ্চিন্ত হইয়াছিল। অপরখানা সুদেষ্ণার হাতে পড়ে—সে অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়াছিল—তবু সে চিঠির জবাব দেওয়া হয় নাই। সুদেষ্ণা চিঠির খসড়া করিয়া দেয়, সে-লেখা অনিন্দিতার সাত-জন্মেও পছন্দ হইবে না। কাজেই উত্তর দেওয়া আর ঘটিল না। তার ছোট ননদ চামেলী তাকে যে-চিঠি লিখিত, তার জবাব সে সঙ্গে-সঙ্গে পাইত। সে বেশ চিঠি লেখে, "ভাই বউ!"—কেমন মিষ্ট সম্বোধন! দু'বার দুটি পদ্যও লিখিয়াছিল। অবশ্য অপরের কাছে ধার-করা। তাহোক্, নির্ব্বাচনে রুচি আছে—পছন্দ আছে।

বাড়ী ফিরিবার পর দাত্তর স্বাস্থ্য দিন-দিন আরও খারাপ হইতে লাগিল। কলিকাতা হইতে বড় বড় ডাক্তার কবিরাজ নিত্য আসেন। যার যত সাধ্য, কোনোদিকে ত্রুটী ঘটে না, রোগ তবু সমান আছে। আশ্রিত প্রতিপালিত, ভক্ত উপকৃত অসংখ্য লোকের অজস্র স্তুতি-মিনতি—তবু রোগ প্রত্যহ যেন বাড়িয়া চলিয়াছে। বাড়ীর সর্ব্বত্র চিন্তার ছায়া। সকলের মুখে উদ্বেগ—সকলেই গম্ভীর হইয়া আছে। আতঙ্কে সকলে যেন কাঁটা!

অনিন্দিতার পিসিমারা বাহিরে ছিলেন, বাড়ীতে আসিলেন। বাড়ীর মেয়েরা সকলেই যাতায়াত করিতে লাগিল। আনন্দনাথরা দুই ভাই

ছুটি লইয়া বাপের রোগ-শয্যার দুই পাশে আসিয়া বসিলেন। উদ্বেগে দুজনে অধীর আকুল!

অনিন্দিতার জীবনের সুখ-শান্তি যেন ফানুশের মত ফাটিয়া চূর্ণ হইয়া গিয়াছে—ভয়ে ভয়ে আকুল চিত্তে কি করিয়া যে তার দিন কাটে! দু'চার দিন একটু আশার কথা শোনা যায়, সকলে হাসে, কথা কয়, অনিন্দিতাও খেলার ঘরে ঢোকে, বই-পত্র লইয়া মাষ্টার মশাই-এর কাছে পড়িতে যায়। আবার একদিন এমন হয়—সকলে ভয়ে কাঠ! সব ওলোটপালট হইয়া যায়!

এমনি করিয়া মাসের পর মাস কাটিয়া গেল। দেশী-বিদেশী নাম-করা ডাক্তার কবিরাজ বাংলা দেশে যে যেখানে ছিল, এ বাড়ীতে কে না আসিল—কে না ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করিল! দু'জন মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ না ডাকিতে আপনা-আপনি আসিয়া দাদুর চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিলেন। কিন্তু কিছুতেই দুরন্ত রোগ কমে না!

আসন্ন বিপদের ছায়ায় সারা গৃহ থম্‌থম্ করিতেছে—সব সময়। কেহ জোর করিয়া একটা কথা বলে না—কেহ দু'দণ্ডের জন্য কাজের তাগিদে বাহিরে গেলে ফিরিবার সময় ভয়ে ভয়ে আসে—না জানি, বাড়ী ঢুকিয়া কি খবর শুনিবে! উৎসব-মুখরিত আনন্দ-কানন নিরানন্দে ভরা! লোকজনের আনাগোনা বাড়িয়াছে—কমে নাই। তাঁদের খাওয়ানোর তদ্বির-তদারকে দিনে-রাতে পরিজনদের অবসর বলিয়া কিছু নাই। অর্দ্ধেক রাত্রি এবং সারা দিন ধরিয়া দাস-দাসী, গৃহবাসী সকলে খাটিয়া খুন হইতেছে। তবু মনে হয়, যেন সে বাড়ী এ নয়। সবচেয়ে বিশৃঙ্খলা ছোটদের মধ্যে। দাদুর তদারকে তাদের জীবন-যাত্রার প্রণালী কেমন সুনিয়ন্ত্রিত ছিল, আজ সে শৃঙ্খলা ভাঙ্গিতে সংসারের এক অদ্ভুত চেহারা তাহাদের চোখে পড়িল! আহারের

সময় ঘণ্টা পড়ে, যথাসাধ্য রুটীন মানা হয়, কিন্তু দাদু সামনে নাই—আহারে কেহ তৃপ্তি পায় না—পরিবেষণেও কাহারো উৎসাহ নাই।

দাদুর ঘরে শুধু এখনও মাঝে-মাঝে হাসির তরঙ্গ ওঠে—ওঠে তাঁহারই ছোটখাট পরিহাসের কথায়। অন্ধকার মুখ, সজল চোখ তিনি সহিতে পারেন না! তাই ছলে-ছুতায় হাসির কথা বলিয়া সকলের হাসি-মুখ দেখেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সকলে দেখে, এই জোর-করা হাসির পর তাঁর মন যেন কেমন বিষাদের মলিন ছায়ায় ভরিয়া ওঠে! অলক্ষ্যে কেহ অশ্রু মুছিবার জন্য ত্রস্তে মুখ ফিরাইয়া লয়। এমন সংসার—এতখানি অকৃত্রিম ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা লাভ কম সৌভাগ্যের কথা নয়! এতখানি ক'জন পায়? এ-সংসারে অন্তরে-বাহিরে এত ঐশ্বর্য্য লইয়া ক'জন বা আসেন! ছোট-বড়, উচ্চ-নীচ, আত্ম-পর—সকলকে সমান দেখা—সকলকে তৃপ্ত করা—দাদু ভিন্ন এমন কে করিয়াছে?

জ্যোৎস্না-সমুজ্জ্বল মধ্য-রাত্রে নদীতীরে বিশ্রাম-শয্যায় অসংখ্য আত্মীয় বন্ধু ভক্ত সেবক পরিবৃত হইয়া সজ্ঞানে হাস্যমুখে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে দাদু রোগজীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া একদিন দিব্যলোকে চলিয়া গেলেন। শোকের আর্ত্তনাদে বিশাল পুরী ভরিয়া গেল।

বসন্তের সাজানো বাগান অকস্মাৎ প্রচণ্ড ঘূর্ণি-বাতাসে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল! আলো নিবিল!

এ আঘাতে অনিন্দিতার পৃথিবী যেন শূন্য হইয়া গেল! তার চিরদিনের দাদু—যার বড় তার আর কিছু ছিল না, কেহ ছিল না—সেই দাদু—অমন মহৎ, অমন স্নেহময় দাদু এমন করিয়া সত্যই তিনি

চলিয়া যাইতে পারেন, তার যেন বিশ্বাস হয় না! রোগ যত কঠিন হোক্‌, বাড়ীতে চিকিৎসকের হাট বসুক, যে দৃঢ়-বিশ্বাসে দেব-দেবীর পায়ের তলায় মাথা কুটিয়া সে বরাবর অভয় পাইয়া আসিয়াছে—তাঁরাও আজ তার অন্তরের প্রার্থনা শুনিলেন না! কিসের উপর নির্ভর রাখিয়া মানুষ চলিবে তবে?

কিন্তু যাহা অসম্ভব, সত্যই তাহা ঘটিল! অনিন্দিতার মনে হইল, এর পর আর কি লইয়া সে বাঁচিবে! যে-পৃথিবীতে আজ দাহুর স্থান নাই,—সেখানে তার স্থান হয় কেন? যে দেবতা তাকে বঞ্চিত করিয়া দাহুকে লইয়া গিয়াছেন, কি অবিচারে তাকে তিনি এখানে রাখিলেন? সারাদিন মাটিতে লুটাইয়া নিজেকে সে প্রশ্ন করিতেছে, এমন করিয়া বাঁচিয়া থাকা কেন? কি প্রয়োজন?

তার এ প্রশ্নের উত্তর কে দিবে? উত্তর পাইবার কোনো উপায় নাই—দাহু ছাড়া কে এ প্রশ্নের উত্তর দিবে?

এ প্রশ্ন কি পৃথিবীতে আজ নূতন? অনেকেই এর বহু বহু পূর্ব্বে এই একই প্রশ্ন চিরদিন করিয়াছে! কেহই এ পর্য্যন্ত এ প্রশ্নের উত্তর পায় নাই।

অনিন্দিতা দাহুকে যেমন করিয়া সকল অন্তর দিয়া আঁকড়াইয়া ছিল, হয়তো তেমন আর কেহ পারে নাই। অনিন্দিতার দিদি সুলতাও তাঁকে দেবতার মত দেখিত, অন্তর দিয়া ভালোবাসিত, কিন্তু তার ভক্তি-ভালোবাসা অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত অন্তপ্রবাহিণী। বাহিরের সব সে আশ্চর্য্য-সংযমে গ্রহণ করে। তার উপর স্বামী, ছেলে—তার স্ত্রীর কর্ত্তব্য—মায়ের কর্ত্তব্য আছে। নিজের দুঃখ লইয়া সে-দুঃখকে এমনি ভাবে লালন করিবে, সে অবসর তার কোথায়? সে এই মহাপ্রলয়ের মধ্যে বাবার জন্য, পিসিমাদের জন্য, অনিন্দিতার জন্য নিজেকে সঁপিয়া দিয়াছে।

শ্রাদ্ধের বিপুল আয়োজন চলিয়াছে—সুলতা পূজারিণীর মত সে আয়োজনে নিজেকে সমর্পণ করিয়াছে।

অনিন্দিতার শোক কেহ বুঝিবে না! দাদু ভিন্ন আর কাহারও মধ্যে সে নিবিড়ভাবে নিজেকে সমর্পণ করিতে পারে নাই! এমন কি, দিদি ছাড়া আর কোনোখানে নিজের কোনো দাবীও সে এ পর্য্যন্ত ভালো করিয়া তোলে নাই! দাদুকেই শুধু সে চিত্তপ্রাণ সমর্পণ করিয়া দিয়াছিল! সেই দাদুকে ছাড়িয়া সে বাঁচিয়া থাকিতে পারে, ইহাতে তার বিস্ময়ের সীমা নাই!

শ্রাদ্ধের আয়োজনে অনেকের মত নিমন্ত্রিত হইয়া অনিন্দিতার স্বামী মিহিরও আসিয়াছিল। ক'দিন ধরিয়া দান-সাগর শ্রাদ্ধের সমারোহের মধ্যে সকলের সঙ্গে মিশিয়া সে এ-বাড়ীতে রহিয়া গেল। কাজকর্ম্ম শেষ হইবার পর একদিন সুযোগ মিলিলে সে অনিন্দিতাকে কহিল, "শুনলুম, তুমি কিছুতে শান্ত হতে পারছো না, খাওয়া-দাওয়া প্রায় ছেড়ে দিয়েছো—কিন্তু অনু, আমাদের কথাও তোমার ভাবা উচিত। দাদুকে কি তুমি একাই হারিয়েছো? আমাদেরও কি কিছু যায়নি?"

অনিন্দিতা স্তব্ধ হইয়া শুনিল। শুনিতে শুনিতে তার মনে হইল, যে-লোক তাঁকে এই সামান্য ক'দিন দেখিয়াছে, সে যখন এমন কণ্ঠে দাদুর বিষয়ে কথা বলিতেছে, তখন তার দুঃখ যে কত বড়, তার হিসাব করা চলে না! উঃ, এ যে কিছুতে সহ্য করা যায় না!

তবু সেদিন দুজনের চোখের জল একসঙ্গে মিশিয়া সেই একই খাতে দুই চিন্তাধারাকে মিশাইয়া এক করিয়া দিল। বিবাহের পর হইতে বৎসরাধিক কাল ধরিয়া এ লোকটিকে সে যত সুদূরের বলিয়া জানিত, হয়তো এ তা নয়! এই দেড় বৎসরে ধীরে ধীরে কেমন করিয়া এই চির-অপরিচিত পরের চেয়েও পর তার এত কাছে

আসিয়াছে, তাহা সে জানিতেও পারে নাই! সব চেয়ে এই বড় সত্যটাই আজ তার চিত্তকে যেন ভারমুক্ত করিল! সে ভাবিল, লোকটি দাদুকে সত্য করিয়াই তাহা হইলে ভালোবাসিয়া ছিল! ভালো না বাসিলে তার গলার স্বরে এ ব্যাকুল স্পন্দন থাকিত না। অনিন্দিতা বয়সে ছোট হইলেও এটুকু বোঝে।

তারপর দুজনে মিলিয়া দাদুর কথা, সেই অতি ছোট বয়স হইতে যাহা-যাহা করিয়াছে—দাদু কবে কি করিয়াছিলেন, কবে কিসে কোন্ কথা বলিয়াছিলেন—অনিন্দিতা তার কিছু ভুলে নাই—একটি একটি করিয়া মিহিরকে বলিতে লাগিল। মিহির একান্তমনে প্রত্যেকটি কথা শুনিতেছিল। বলিতে বলিতে অনিন্দিতার কণ্ঠ কখনো আবার আবেগে গলিয়া যায়—কখনো রুদ্ধ হয়—কখনো দু'চোখে জল ঝরে—মিহির নিশ্বাস ফেলে, অনিন্দিতার চোখ সযত্নে মুছাইয়া দেয়! তাহাতে এত বড় শোকের সাগরে অনিন্দিতা যেন কূলের রেখা দেখিতে পায়। শুনিতে মিহিরের যেমন আগ্রহ—অনিন্দিতাও তেমনি বিরামবিহীন বলিয়া চলিয়াছে!

ইহার পর যে ক'দিন রহিল, মিহির প্রত্যহই সময় করিয়া অনিন্দিতার কাছে বসিয়া খুঁটিয়া খুঁটিয়া দাদুর কথা শুনিতে চাহিত এবং সে কথা লইয়া তাঁর উপর যে ভক্তি-শ্রদ্ধা ভালোবাসার কথা বলিত—শুনিয়া অনিন্দিতা আশ্চর্য্য হইত, ভাবিত, বাহিরের এ মানুষটি তাঁর মনের এত পরিচয় কি করিয়া জানিল?

মিহির বাড়ী ফিরিয়া গেলে অনিন্দিতা কেমন শূন্যতা অনুভব করিল। নিজের দুঃখের স্মৃতি লইয়া আবার সে কাতর হইয়া পড়িল। তবে এটুকু সে স্পষ্ট বুঝিয়াছে, বঞ্চিত না হইলে

কাহাকেও কখনো যথার্থরূপে পাওয়া যায় না! হারানো জিনিষকে মানুষ যেমন নিবিড় ভাবে মনে রাখে, কাছের বস্তুকে তেমন রাখিতে পারে না! তার দরকারও হয় না! দাদুকে হারাইয়া তাঁর দাম যে কত বড়, এখন যেমন জানিতে পারিয়াছে, তিনি বাঁচিয়া থাকিতে কি তেমন পারিয়াছিল? কবে অনিন্দিতার কি ত্রুটী-বিচ্যুতি ঘটিয়াছিল—সেজন্য তাঁহাকে ঈষৎ অসন্তুষ্ট করিয়াছে, সে কথা মনে পড়িতেছে—অমনি লজ্জায় ক্ষোভে তার মরিয়া যাইতে ইচ্ছা হইতেছে।

একদিন মানুষ আবার নূতনকে অবলম্বন করিয়া নিজের অজ্ঞাতে প্রিয় স্মৃতি ভুলিয়া যায়—অনিন্দিতার মন ধীরে ধীরে একদিন স্মৃতির স্তূপ ছাড়িয়া বাস্তব জগতে ফিরিয়া আসিল—কি করিয়া আসিল, অনিন্দিতা জানিতেও পারিল না।

বিংশ পরিচ্ছেদ

বাড়ীতে এদিকে বিপ্লবের তাণ্ডব চলিয়াছে—তখন যুগ-সন্ধিক্ষণ! বাড়ীতে পর-পর আরো মৃত্যু ঘটিল—জ্যাঠাইমা চলিয়া গেলেন—তার পর জ্যাঠামশায়ও গেলেন। আনন্দনাথ যে স্নেহের আড়ালে ছিলেন, সে আড়াল ভাঙ্গিয়া গেল। সংসারে তিনি এখন একা। এক বৎসরের মধ্যে অকস্মাৎ পিতাকে এবং জ্যাঠামহাশয়কে হারাইয়া তিনি যেন অকূল-সমুদ্রে পড়িলেন। বিপুল সংসার এবং বিষয়-সম্পত্তি প্রভৃতির সকল দায়িত্ব তাঁহার মাথায় পড়িল। আয় তিন-ভাগ কমিয়া গেলেও ব্যয় প্রায় সমান রহিল। আত্মীয়স্বজন প্রতিপালিতদের বিদায় দেওয়া যায় না। বৈষয়িক কর্ম্মচারীদেরও প্রয়োজন। দান-দাক্ষিণ্যও এ-পরিবারে পুরুষ-পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে—তাহারও বিলোপ চলে না। ক'জন দাস-দাসীকে শুধু জবাব দেওয়া হইল। খাওয়া-দাওয়ায় কতক 'ইকনমিক্যাল' ব্যবস্থার চেষ্টা চলিল।

মায়ের মাথায় বিপুল সংসারের ভারী বোঝা চাপিল। সুলতা বড়-একটা আসিতে পারে না—অনিন্দিতাই মায়ের ডান হাত হইয়া উঠিল। জ্যাঠামশায়ের অনাথ ছেলেমেয়েরা—ক'টি ভাইবোন—তাদের দেখাশুনার ভার অনিন্দিতার উপর। মা বলিলেন, "তুই ছেলেমানুষ—দেখতে পারবিনে রে! আমি দেখবো। তবে দোষ করলে শাসন—সে ভার তোর উপর রইলো।"

দাদু তাকে ছোটবেলা হইতে ভাইবোনদের যত্ন করিতে শিখাইয়াছিলেন, সে কি এই জন্যই?

নিজের মায়ের পেটের ভাইবোনদের সহিত জ্যাঠামশায়ের

ছেলেমেয়েদের তিনি যে কোন ভেদ রাখিতে দেন নাই, সেও কি ধ্যান-দৃষ্টিতে তিনি ভবিষ্যৎ দেখিয়াছিলেন বলিয়া ?···

যত দিন যাইতেছে, অনিন্দিতা দাদুকে যেন নূতন আলোয় আরো স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইতেছে ! হয়তো কাছে থাকিলে এমন করিয়া সে কোনোদিন দেখিতে পারিত না ! হয়তো তাঁর সুগভীর স্নেহে ডুবিয়া সারা জীবনেও তাঁকে চিনিয়া লইতে পারিত না ! অতি-নৈকট্যে মানুষ তেমন দেখিতে পায় না বলিয়াই হয়তো ভগবান বঞ্চনা করিয়া মানুষকে দেখিতে শিখান ! হয়তো সে তাঁকে ভালো করিয়া চেনে নাই বলিয়াই তাঁহাকে হারাইতে হইল—তাঁহাকে সত্য করিয়া পাইবার জন্য !

দাদুর পরিত্যক্ত ঘরগুলায় তাঁর সব স্মৃতি সঞ্চিত রহিয়াছে। পুরাতন ভৃত্য ঝাড়িয়া-মুছিয়া প্রত্যহ সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে। যখনই সময় পায়, অনিন্দিতা এই সব ঘরে শূন্যমনে ঘুরিয়া বেড়ায়। ঝাড়ন দিয়া ঝাড়া বইগুলিকে আঁচল দিয়া সযত্নে মোছে। বড় বড় অয়েল-পেন্টিংগুলার নীচে হাঁটু ভাঙিয়া বসিয়া পড়ে,—উর্দ্ধে মুখ তুলিয়া চিত্র-করা মুখ নির্নিমেষে দেখিতে থাকে ! দেখিতে দেখিতে দু'চোখ জলে ভরিয়া ওঠে। কখনও পায়ের কাছে লুটাইয়া একান্ত-মনে ডাকিয়া বলে, "তুমি কোথায়, দাদু ? আমায় তোমার কাছে নিয়ে যাচ্ছো না কেন ? তুমি কি জানো না, তোমায় ছেড়ে আমি থাকতে পারি না ?"

মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে সকাতরে জানায়, "নিয়ে যাবে, দাদু ? আমি যে আর এখানে থাকতে পারছি না।"

"অনি ! তুই এখানে পড়ে আছিস্ ! আমি তোকে কোথাও খুঁজে না পেয়ে"—সুলতা আসিয়া দু'হাতে তাহাকে জড়াইয়া বুকে

টানিয়া লইল। তারপর দু'জনের চোখের জল গঙ্গা-যমুনার মত এক-খাতে বহিল। গভীর দুঃখে এইটুকুই সান্ত্বনা!

আগে অনিন্দিতার তেমন অবসর না থাকিলেও এখন ঠিক আগের মত নাই। পড়াশুনার ব্যবস্থা উল্টাইয়া গিয়াছে! সকালে ব্যাকরণ পড়ার পণ্ডিত আর পড়াইতে আসেন না। দুপুরবেলার মাষ্টারমশাই এখন অন্য কাজে নিযুক্ত। দাদুর কাছে পড়াই ছিল আসল পড়া, সে পড়া চুকিয়া গিয়াছে। অনিন্দিতার মনে হইল, তাঁর অত দিনের অত চেষ্টা-যত্ন সে নিজের জীবনে ব্যর্থ করিয়া দিবে? দাদুর লাইব্রেরীতে বই-এর অভাব নাই, সংস্কৃত এবং বাংলা বই সে নির্বিচারে পড়িতে লাগিল। ইংরাজীটায় অন্যের সাহায্য প্রয়োজন। পড়ার দিকে তার কত ঝোঁক—সে বুঝিবার আগে দাদু বুঝিয়াছিলেন, আশ্চর্য্য!

দিন কাটিয়া চলিয়াছে। গ্রীষ্মের দীপ্তি-সমুজ্জ্বল দিবস, মন-উদাস-করা দুঃখের স্মৃতির মত তপ্ত হাওয়া কখনও রুদ্র, কখনও মৃদু নিশ্বাসে বহিয়া চলিয়া গেল! বর্ষার মেঘভারনত আকাশের নীচে তাল-নারিকেলের উচ্চশির বাদলা হাওয়ায় দুলিয়া দুলিয়া ওঠে! বাগানের এক প্রান্তে কৃষ্ণচূড়ার গাছে যেন হোলির আবীর ছড়ানো ছিল—বর্ষার জলস্রোতে সে-রঙ মুছিয়া গিয়াছে! গাঢ় শ্যামলিমায় তার আদ্যোপান্ত স্নিগ্ধ-সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে! শরতের আকাশ একেবারে মেঘমুক্ত—উদার মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে! যেমন স্বচ্ছ, তেমনি নীল। নদীর ধারে যেখানে বসতি নাই, কাশের বন সাদা হইয়া উঠিয়াছে। যেন বকের পাল আসিয়া মিলিয়াছে! শিউলি-তলায় ভোর না হইতেই ভিড়ের সীমা নাই! ছোট ছোট মেয়েরা ভিজা-পায়ে কোঁচড় ভরিয়া শিশিরসিক্ত ফুলে আঁচল ভিজাইয়া হাস্য-কলরবে চারিদিক আনন্দ-মুখর করিয়া তুলিয়াছে! দুপুরে আসন্ন

দুর্গাপূজার আয়োজন-উদ্যোগে বাড়ীর গিন্নীদের, দাস-দাসীদের দিবা-নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। নূতন কাপড়-জামার, নানা প্রসাধনের আমদানীতে বাজার সরগরম। ঘরে ঘরে আগ্রহের সীমা নাই।

পূজার ষষ্ঠীর দিন অনিন্দিতা বাড়ী আসিল। বয়সে নিতান্ত কম বলিয়া শ্বশুর-ঘর করার সময়ের আরও এক বৎসর বাকী আছে। কিন্তু এ-বাড়ার কর্ত্তা অকাট্য যুক্তি দিয়া সে চুক্তিকে একটু 'কারটেল' করিয়া লইলেন। মাঝে মাঝে যাতায়াত না থাকিলে শ্বশুর-ঘর কত আপনার হওয়া উচিত, তাহা বুঝিবে কেন? বিশেষ যখন অনিন্দিতার নিজের শাশুড়ী বাঁচিয়া নাই এবং তাঁর অন্য সন্তানগুলি রহিয়াছে এবং অনিন্দিতাই বাড়ীর বড় বউ!

আনন্দনাথ এ-যুক্তি অস্বীকার করিতে পারেন নাই। তার উপর একটা খণ্ডন-যুক্তি ছিল, পূজার ছুটিতে মিহিররা পশ্চিমে বেড়াইতে যাইবে—সে সময়টা নূতন বধূ তাঁদের কাছে থাকিলে তাঁরা একটু তৃপ্তি পাইবেন! আনন্দনাথ মেয়ে পাঠাইতে সম্মত হইলেন—যদিও এ-বাড়ীর মেয়েদের কম বয়সে শ্বশুরবাড়ী যাওয়া-আসা তেমন বেশী ঘটিত না। তার অনেক কারণও ছিল। বর্দ্ধিষ্ণু ব্যক্তিরা বেশীর ভাগ তখন পল্লীগ্রামে থাকিতেন এবং সে সময় বাংলায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ—কলের জল, টিউবওয়েল প্রভৃতির অভাব শুধু পল্লীগ্রামে নয়, সহর এবং সহরতলীতেও খুব বেশী ছিল। অনিন্দিতার শ্বশুরবাড়ী যেখানে, সেখানে ম্যালেরিয়া নাই—কলিকাতার খুব কাছে বেশ সমৃদ্ধ গ্রাম। কথা রহিল, পূজার ছুটিটা পূরাপূরি সে ওঁদের সঙ্গে থাকিবে।

মিহিরদের বাড়ী প্রায় ষাট-সত্তর বৎসর পূর্ব্বের সমৃদ্ধিসম্পন্ন গৃহস্থ-বাড়ীর অনুরূপ। বরং তার চেয়েও কিছু বড় এবং জমকালো। বাড়ী এখন দুই ভাগে ভাগ হইয়াছে—মাঝখানে বড় ঠাকুর-দালান,

এখন 'ভাগের মা' হওয়ায় কতক অসংস্কৃত-অবস্থায় পড়িয়া গিয়াছে! ঠাকুর-দালানের সামনে মস্ত উঠান, তার দু-ধারে একতলা বহির্ব্বাটীর সারি-বাঁধা ঘর, শান-বাঁধানো রোয়াক, অন্য দিকে প্রশস্ত দ্বিতল অট্টালিকা। পুরাতন হইলেও সুসংস্কৃত। বাড়ীতে পরিজন নিতান্ত অল্প নয়। তরুণ ছেলেদের মধ্যে কেহ সদ্য পাঠ শেষ করিয়া কাজকর্ম্মে ঢুকিতেছে, বেশীর ভাগ কলেজে আর স্কুলে পড়ে। ঘরে অনেকগুলি বউ আসিয়াছে। অনিন্দিতাই সকলের ছোট বউ। মেয়েদের সে সময়কার নিয়মে কমবয়সে বিবাহ হইয়া গিয়াছে, কেহ কেহ ছেলে-মেয়ের মা হইয়াছে। সমবয়সী ও প্রায়-সমবয়সী মিলিয়া পাঁচ-ছজন একত্র হইয়াছে। তার উপর বাড়ীর অর্দ্ধাংশ যে জ্ঞাতিদের, তাঁদের বাড়ীতেও অনেকগুলি মেয়ে-বউ। ঠাকুর-দালানের পাশ দিয়া দোতলার একটা ঘর দিয়া সেদিকে যাওয়া-আসা করা যায়।

অনিন্দিতা এই নূতন জগতের নবীন পরিবেশে আশ্চর্য্যরূপে মিশিয়া গেল। সে যদি ছেলেমানুষ না হইত, নিজের এই নূতন পরিচয়ে নিশ্চয় বিস্ময় অনুভব না করিয়া থাকিতে পারিত না! তার বাপের বাড়ীর জীবনযাত্রার সঙ্গে এখানে এ নূতন জীবনের কি অদ্ভুত পার্থক্য—তবু তার তেমন বাধিল না। ছোটবেলা হইতেই মেয়েদের শিক্ষা—এই ঘরই তাদের চিরজন্মের ঘর—এ কথাটা মাথায় ঢুকাইয়া দেওয়া হইত! তার উপর সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী—এঁদের দৃষ্টান্ত! তাছাড়া দাদু বলিয়াছিলেন, "বড়লোকের ঘরে বিয়ে দিচ্ছি না—তাঁদের মনে কখনও কষ্ট দিও না। তাঁরা তোমায় যা দেবেন, মাথায় তুলে নেবে। যেমন রাখবেন, হাসিমুখে তেমনি থাকবে।" আজ দাদু এ-পৃথিবীতে নাই, কিন্তু স্বর্গে বসিয়া আরও বেশী করিয়া সব দেখিতে পাইতেছেন!

এখানেও খুব ভোরে ঘুম ভাঙ্গে! দাদুর শিক্ষায় এ-অভ্যাস

হইয়াছে—তাই এখানে কষ্ট নাই। পুষ্পচয়ন, পূজার আয়োজন করিতে হয়। সে কাজেও তার অভ্যাস আছে। বালিকা হইয়াও সহজে তাই বাড়ীর কর্ত্তৃপক্ষের প্রশংসা লাভ করিল। সংসারের কাজ-কর্ম্ম তেমন জানা ছিল না, কিন্তু ঐ সব সাধারণ কাজকর্ম্মের জন্য প্রয়োজন—ধৈর্য্য এবং মনোনিবেশ। অনিন্দিতার প্রকৃতি চঞ্চল হইলেও মর্য্যাদাবোধ এবং দাদুর কথা মনে করিয়া এ বয়সেই সে নিজেকে ঠিক করিয়া লইতে পারিয়াছে। কোনো কাজ জানে না বলিয়া লোকের চোখে নিজেকে ছোট করিবে,—তাহা সে পারে না। কাজেই ছোটখাট ঘর-গৃহস্থালীর অনেক কাজকর্ম্ম আস্তে আস্তে সে করিতে লাগিল—কিন্তু প্রায়-সমবয়স্কা বা কিছু-বয়ঃজ্যেষ্ঠা সঙ্গিনীদের সাহায্যে মাঝে মাঝে গৃহস্থের অল্পস্বল্প ক্ষতি করিয়া ফেলিলেও তাহাকে নিতান্ত অপদস্থ হইতে হইত না।

পূজার ক'দিন বাদ দিয়া মিহিররা ক'জনে পশ্চিমে বেড়াইতে গেল। যাত্রার পূর্ব্বে ক'রাত্রি তাদের দেখাশুনার যেটুকু সুযোগ ঘটিয়াছিল, তাহাতে দুজনের মধ্যে যে-সান্নিধ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা প্রায় কাঁচিয়া উঠিবার মত হইয়াছিল। এ-বাড়ীতে আহারাদি শেষ হইতে অনেক রাত্রি হয়। বিশেষ পূজার সময় নানা কাজকর্ম্ম এবং আত্মীয়-কুটুম্বের যাতায়াতে দিনে-রাতে সময়ের হিসাব রাখা প্রায় অসম্ভব। কাজেই শ্রান্ত ক্লান্ত বালিকা নববধূ আধ-ঘুমন্ত অবস্থায় ঘরে আসিতেই ঘুমাইয়া পড়ে। আর, একবার ঘুমাইলে অনিন্দিতাকে ডাকিয়া তোলে, কাহার সাধ্য! ভোরের দিকে যখন ঘুম ভাঙ্গে, মিহিরের তখন ঘুম ভাঙ্গে না। এ-বাড়ীতে আসিয়া পর্য্যন্ত মিহিরকে সে বন্ধু হিসাবে অনায়াসে গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু স্বামী

বলিয়া তার কাছে সে এ-পর্য্যন্ত আত্মনিবেদন করিতে পারে নাই! মিহিরও সেদিক দিয়া তাহার শিশু-প্রকৃতিকে আঘাত দিতে ইচ্ছুক ছিল না। তবে সংযত ও একান্ত ভদ্র হইলেও মিহির মানুষ। কাজেই গৃহপালিতা শকুন্তলা বা কপালকুণ্ডলাকে সে সব সময়ে ঠিক চিনিয়া উঠিতে পারে না! তার ব্যবহারে কখনও মনে হয়, নির্লিপ্ত—কখনও মনে হয়, অবজ্ঞা-তাচ্ছিল্য। সেজন্য মিহিরের অভিমান হয়!

সেদিন শুক্লা-দশমীর জ্যোৎস্না-সমুজ্জ্বল মধ্যরাত্রি। আকাশ-পৃথিবী ভরিয়া যেন রজত-সমুদ্রের ঢেউ ছুটিয়াছে। অদূরে জাহ্নবীনীরে চন্দ্র-প্রতিচ্ছায়া। বিজয়ার অভিনন্দনের শেষ পর্ব্ব তখনও শেষ হয় নাই। রাত্রি অনেক হইয়াছে, লোকের ভিড় কমিয়াছে—আহারান্তে নিজের ঘরে যাইবার জন্য অনিন্দিতার এবং অন্য বৌ-মেয়েদের উপর আদেশ হইল। অনিন্দিতা নিজের ঘরে আসিল। ঘরে ক'টা জানলা খোলা। খোলা জানলা দিয়া ঘরে জ্যোৎস্নার জোয়ার আসিয়াছে যেন! দূরে কে যেন বাঁশী বাজাইতেছে? ঘরের নীচে শান-বাঁধানো আঙ্গিনার দু-ধারে দুটি নারকেল গাছ—ফলভারে পূর্ণ। গাছ দুটির মাথায় রূপা-গলানো জ্যোৎস্নার ধারা। মৃদু মৃদু বাতাসে গাছের পাতাগুলা দুলিতেছে। শব্দ হইতেছে। মনে হইতেছে, গাছ যেন আনন্দে কলকূজন তুলিয়াছে!

অনিন্দিতা ঘরে ঢুকিয়া সামনের জানলার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। একটা কামিনীফুলের ছোট গাছে ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। এক-ঝলক বাতাসে তাহারই সুবাস আসিয়া যেন তাহার সর্ব্বাঙ্গে মিষ্টগন্ধী প্রসাধন মাখাইয়া দিল! আকাশের চাঁদ ঠিক তার মুখের

উপর জ্যোৎস্না ঢালিয়া দিল। এই সব চির-পরিচিত বস্তুর মধ্যে হঠাৎ তার মন কেমন যেন ব্যাকুল হইয়া উঠিল! যে-স্মৃতিকে কোনমতে ঠেলিয়া সে এই নূতন পরিবেশে নিজেকে সমর্পণ করিয়া দিয়াছে—সে মনে আবার সেই অতীত স্মৃতির দোলা!

বহিঃপ্রকৃতি যেন ষড়যন্ত্র করিয়াই তার হৃদয়াবেগ উচ্ছ্বসিত করিতে চায়! ঐ নারিকেল গাছ দুটা শরৎ-জ্যোৎস্না-রূপের খেলা দেখাইবার জন্যই যেন নানা ভাবে তাদের দীর্ঘ পত্ররাজি সঞ্চালন করিতে করিতে অর্দ্ধস্ফুট মিষ্ট ভাষায় তাহার কানে কত কথাই বহিয়া আনিতেছে! এদের ভাষা অনিন্দিতারই প্রাণের ভাষা। এ-সব তার অপরিচিত নয়! বরং রান্নাঘরে বসিয়া যে-সব গল্প-আলোচনা হয়, যে-সব হাসি-গান সঙ্গিনীরা চাপা গলায় অনর্গল উৎসারিত করিতে থাকে, অজানা অপরিচিতাদের সে-সবের খানিকটা সে উপলব্ধি করে। অনেক ইঙ্গিত, অনেক ইসারা সে অবাক হইয়া শোনে, ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া চাহিয়া দেখে—রহস্যালাপকারিণী অপ্রতিভের একশেষ হয়। রাগ করিয়া কেহ বলে, "আহা গো, ঠিক যেন কপালকুণ্ডলা মৃন্ময়ী! সদ্য নভেল থেকে নেমে এসেছেন!" কিন্তু এদের কথায় ভুল হয় না, প্রাণ আনন্দে সাড়া দেয়।

ঘরের বাঁ-ধারের ঐ পত্রবিরল সজিনা গাছের ডালে বসিয়া সেই চিরকেলে পাখীটা তার চেনা গলায় সজোরে ডাক আরম্ভ করিয়া দিল—'বৌ কথা কও', 'বৌ কথা কও'! বুক যেন ভরিয়া ওঠে! কিন্তু কি নির্ব্বোধ এ-বাড়ীর ঐ ছোট মেয়েটি—যে তার মুখে "ছোট ঠাকুরঝি" সম্বোধন শুনিবার জন্য তাকে পীড়ন করে! ঐ অদ্ভুত নামে ডাকিলে অভিমানে উত্তর না দিয়া সে ঠোট ফুলায়, চিমটি কাটে—

আবার অন্যমনস্ক থাকিলে গলা জড়াইয়া প্রায় কোকিলকণ্ঠে মৃদুস্বরে সে গান গাহিয়া ওঠে ;—

"কেন রাই একলা বসে বয়ান ভাসে
নয়ন নীরে,
কেঁদে কি পাগল হবি, শ্যাম কিলো
তোর আসবে ফিরে !"

সেদিন তার কানের কাছে মুখ আনিয়া কি না ছাই বলিল, উঃ, কি মিথ্যুক ! বলে, "পাখী কি বলছে, জানো ? পাখী বলছে, বৌয়ের খোকা হোক ! বৌয়ের খোকা হোক !"

ছি ছি ! যদি একটু কাণ্ডজ্ঞান থাকে ! পাখীরা চিরদিন বলে, "বৌ কথা কও, বৌ কথা কও !"

ও গানটা সেদিন বড় ভালো লাগিয়াছিল—রাধিকার গান। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন—কাঁদিয়া কাঁদিয়া শ্রীরাধা পাগল হইতে বসিয়াছেন। সখীরা কত প্রবোধ দিতেছে—কাঁদিয়া পাগল হইলে তো শ্যাম আর ফিরিয়া আসিবেন না। চোখের জলে সাগর রচিলেও কখন আসিবে না। পাগল হইয়া ছুটিয়া বেড়াইলেও, আসিবে না। এ-কথা খুব সত্য।

অনিন্দিতা এত যে ডাকিয়াছে, কই, দাদু কি একবার দেখা দিতে পারিলেন ? কিন্তু কেন ? কেন দিলেন না ? রামায়ণে, মহাভারতে, ভাগবতে, হরিবংশে সর্ব্বত্র দেখা যায়, ইহলোক পরলোকে ব্যবধান খুব বেশী নয় ! বিদেহী আত্মা ইচ্ছা করিলেই সর্ব্বত্র গতায়াত করিতে পারে ! তবে কেন, কেন তিনি তাঁর অনিন্দিতাকে একটিবার দেখা দিয়া বলিয়া যান না, "আমি তোমার কাছেই আছি। সব সময় দেখতে পাচ্ছি। তুমি শান্ত হও, ভালো

হও, সুখী হও।" আজ এই বিশ্ব-প্লাবিত শারদ-জ্যোৎস্নায় স্বর্গে-মর্ত্ত্যে যখন সব একাকার হইয়া গিয়াছে, এই পুণ্য বিজয়া দশমীর আশীর্ব্বাদ-ধারা-বর্ষিত রাত্রে আজও তিনি তাঁর অনিন্দিতার মাথায় মঙ্গল-করস্পর্শ দিয়া তার বিয়োগ-দুঃখ দূর করিয়া আশীর্ব্বাদের পুণ্য শীতল-ধারা ঢালিয়া দিবেন না? হঠাৎ আর্ত্তকণ্ঠে আকুল স্বর ঠেলিয়া বাহির হইল, 'দাদু! দাদু!'

জানলার লোহার গরাদের উপর মাথা রাখিয়া সে অজস্রধারে চোখের জল ফেলিতে লাগিল। "দাদু! কোথায় তুমি!"

"অনিন্দিতা! অনু! কাঁদছো?"

চমকিয়া অনিন্দিতা মাথা তুলিল। মিহির কখন ঘরে আসিয়াছে, সে দেখে নাই! স্তব্ধ নত নেত্রে অনিন্দিতা দাঁড়াইয়া রহিল, প্রাণপণে উদ্গত অশ্রু নিরোধের চেষ্টা করিয়াও অশ্রু রোধ করিতে পারিল না।

"বাড়ীর জন্যে মন কেমন করছে?"

অনিন্দিতা মাথা নাড়িয়া জানাইল—"না।"

"তবে? বুঝেছি, দাদুর কথা মনে করে কাঁদছো! কিন্তু দাদুর কথা মনে করে কাঁদা উচিত নয়! তুমি তো বিশ্বাস করো, তিনি স্বর্গে আছেন! সেখান থেকে তোমায় তিনি দেখতে পাচ্ছেন। তবে? তোমায় অসুখী দেখলে তিনি কি সুখী হবেন?"

অনিন্দিতা সচমকে ফিরিয়া দাঁড়াইল—সাগ্রহে মিহিরের খুব কাছে সরিয়া আসিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে কহিল, "আচ্ছা, তিনি আজ আমাদের আশীর্ব্বাদ করতে এসেছিলেন? বলো—তোমার কি মনে হয়? এসেছিলেন?"

মিহির অনিন্দিতার দু-হাত সযত্নে নিজের হাতে জড় করিয়া ধরিয়া তার মুখের পানে সপ্রেম দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে হাত

ছুটি ছাড়িয়া শান্ত স্বরে বলিল, “তিনি এর আগে আসেননি—এখন এসেছেন। আমাদের দু'জনকে একসঙ্গে আশীর্ব্বাদ করবেন বলে তিনি এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলেন। এসো, আমরা তাঁকে একসঙ্গে প্রণাম করি।”

অনিন্দিতা মন্ত্র-চালিতের মত মিহিরের অনুজ্ঞাবর্ত্তিনী হইয়া তার পাশে মাটিতে মাথা রাখিয়া গভীর শ্রদ্ধায় অনেকক্ষণ ধরিয়া দাদুর শ্বেতপদ্মের মত পা দু'খানি স্মরণ করিয়া প্রণত রহিল। তারপর মাথা তুলিতে হঠাৎ মনের মধ্যে কি যেন অনৈসর্গিক ভাবের প্রবাহ বহিল! সেই মুহূর্ত্তে মনে হইল, মিহির তার একান্ত হিতৈষী, সত্যকারের বন্ধু এবং তার স্বামী,—অথচ এমন অকৃতজ্ঞ সে—কোনো-দিন মিহিরকে দেখে নাই—বোঝে নাই! তার এ অযাচিত মমতা কখনও স্বীকার করে নাই! সে যে মিহিরের স্ত্রী—এ-কথা তার মনেও হয় নাই!

গভীর কৃতজ্ঞতায় অনিন্দিতার মন পূর্ণ হইয়া উঠিল। আজ বিজয়া-দশমী—বিশেষ তিথি। সে মিহিরকে প্রণাম করিবে বলিয়া মিহিরের পায়ের কাছে নত হইতেই মিহির তার হাত ধরিয়া তাকে তুলিল; তুলিয়া উচ্ছ্বসিত-আবেগে মিহির বলিল, “তুমি নিজে থেকে ইচ্ছা করে আমাকে কিছু না দিলে আমি তোমার কাছে কখনো কিছু চাইবো না—তোমার কাছ থেকে কিছু নেবো না, এই ছিল আমার পণ। আজ নিজে থেকে তুমি আমায় প্রণাম করছো, এই প্রণাম হোক আমাদের মিলন—আমাদের ভালোবাসার ভিত্তি। আর আমাদের এ ভালোবাসা দাদুর আশীর্ব্বাদে হবে অক্ষয় অমর! তিনি এখানে এসেছেন—আমি উপলব্ধি করছি! এসো, দু'জনে তাঁকে প্রণাম করি।”

দেওয়ালে দাদুর ছবি—সেই ছবির সামনে দু'জনে নত হইয়া

একসঙ্গে প্রণাম করিল ; তারপর অনিন্দিতা প্রণাম করিল মিহিরকে ! মিহির তাকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া আবেগজড়িত কণ্ঠে বলিল, "এতদিন পরে আজ আমাদের বিবাহ সত্য হলো ! আমি তোমার স্বামী ! আর তুমি—"

পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে মিহিরের পানে চাহিয়া আবেগভরে অনিন্দিতা বলিল, "আমি তোমার স্ত্রী !"

—শেষ—